~ Tin Goenda Series ~

Pathore bondi By Rakib Hasan
Goenda robot By S. Nawab
Kalo pichash By S. Nawab

For more free Books,Songs,Software,
PC games,Movies,Natok,
Mobile ringtones,games and themes etc.
please visit
www.murchona.com/forum

Scanned By:

Abu Naser Mohammad Hossain (Sumon)

Email:

anmsumon@yahoo.com,anmsumon@gmail.com

ভলিউম ৬৬

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান/ শামসুদ্দীন নওয়াব

পাথরে বন্দী: অদ্ভুত আংটি। মাঝখানে বসানো সাদা পাথরটা কালো হয়ে যায়, ভিতরে ধোঁয়াটে কিছু নড়াচড়া করে। ভিতর থেকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে ভয়ঙ্কর কী যেন! শয়তানি হাসিতে ভরে গেল শুঁটকি টেরির মুখ। আর কলজে শুকিয়ে গেল রবিনের।

গোয়েন্দা রোবট: বিজ্ঞান মেলা হচ্ছে কিশোরদের স্কুলে।
কিন্তু গোপনে কে যেন সেরা দুটো প্রজেক্ট চুরমার করে দিল। কিশোরের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন বেশ কজন।
তাদের মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে হবে অপরাধীকে।
ম্যাডাম কেসটা তুলে দিলেন তিন গোয়েন্দার হাতে।

কালো পিশাচ: সুকভিলে বেড়াতে এসে এ কী ফ্যাসাদে পড়ে গেল তিন গোয়েন্দা! আকাশ থেকে নেমে এল বিজলী। জ্যান্ত হয়ে উঠল নিরীহ বিদ্যুতের তার। কালো পিশাচ ঢুকে পড়েছে বাসার ভিতরে। খুঁজে বেড়াচ্ছে শিকার। এবার আর নিস্তার নেই তিন গোয়েন্দার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভলিউম ৬৬ তিন গোয়েন্দা রকিব হাসান/ শামসুদ্দীন নওয়াব

তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৬৬

রকিব হাসান
শামসুদ্দীন নওয়াব

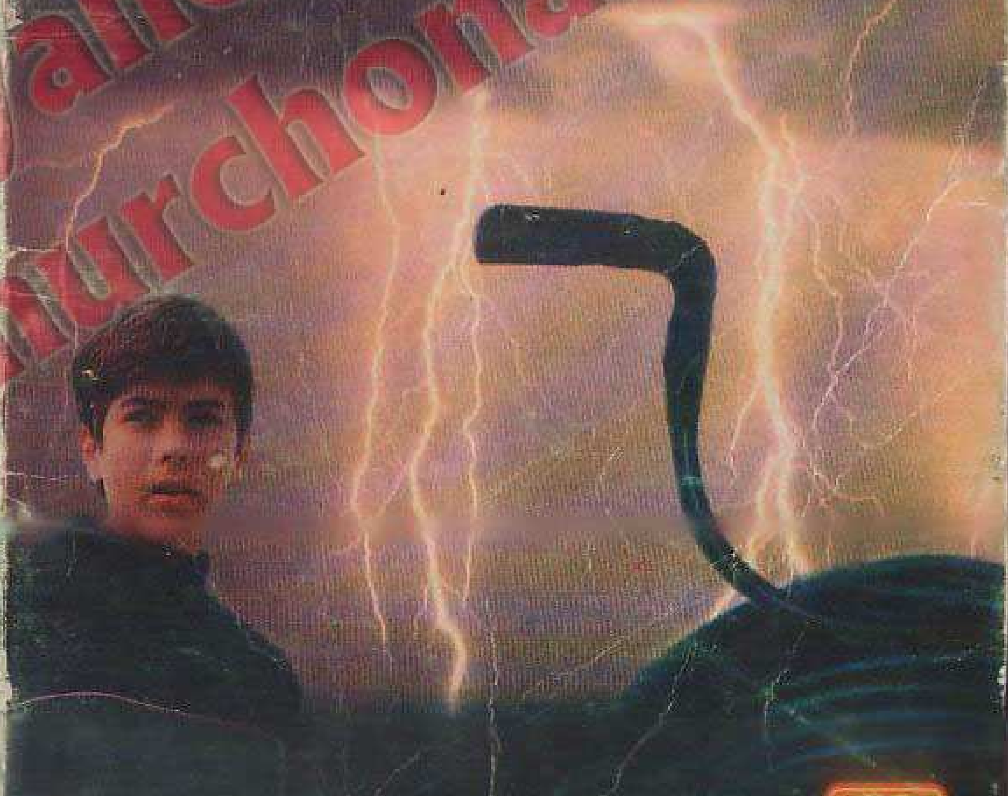

কিশোর থ্রিলার

সেবা প্রকাশনী

ammsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com

পাথরে বন্দী/রকিব হাসান : ৭–৬৮
গোয়েন্দা রোবট/শামসুদ্দীন নওয়াব : ৬৯–১০৪
কালো পিশাচ/শামসুদ্দীন নওয়াব : ১০৫–১৪৪

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ১/১	(তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা)	৫০/-
তি. গো. ভ. ১/২	(ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো)	৫০/-
তি. গো. ভ. ২/১	(প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগর সৈকত)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২/২	(জলদস্যুর দ্বীপ-১,২, সবুজ ভূত)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩/১	(হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩/২	(কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪/১	(ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১,২)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৪/২	(ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫	(ভীতু সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৬	(মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৭	(পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভুতুড়ে সুড়ঙ্গ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৮	(আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ৯	(পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১০	(বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১)	৪৭/-
তি. গো. ভ. ১১	(অথৈ সাগর ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১২	(প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৩	(ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৪	(পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ১৫	(পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ১৬	(প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৭	(ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ)	৪৬/-
তি. গো. ভ. ১৮	(খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ১৯	(বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্তানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২০	(খুন, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২১	(ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ২২	(চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত)	৪২/-
তি. গো. ভ. ২৩	(পুরানো কামান, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন)	[illegible]
তি. গো. ভ. ২৪	(অপারেশন কক্সবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ)	*৩৭/-
তি. গো. ভ. ২৫	(জিনার সেই দ্বীপ, কুকুরখেকো ডাইনী, গুপ্তচর শিকারী)	৪৪/-
তি. গো. ভ. ২৬	(ঝামেলা, বিষাক্ত অর্কিড, সোনার খোঁজে)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ২৭	(ঐতিহাসিক দুর্গ, তুষার বন্দি, রাতের আঁধারে)	৪১/-
তি. গো. ভ. ২৮	(ডাকাতের পিছে, বিপজ্জনক খেলা, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ)	৪৮/-
তি. গো. ভ. ২৯	(আরেক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, সৈকতে সাবধান)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৩০	(নরকে হাজির, ভয়ঙ্কর অসহায়, গোপন ফর্মুলা)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩১	(মারাত্মক ভুল, খেলার নেশা, মাকড়সা মানব)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩২	(প্রেতের ছায়া, রাত্রি ভয়ঙ্কর, খেপা কিশোর)	৪৫/-
তি. গো. ভ. ৩৩	(শয়তানের থাবা, পতঙ্গ ব্যবসা, জাল নোট)	৪১/-

anmsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com©

তি. গো. ভ. ৩৪	(যুদ্ধ ঘোষণা, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর)	৪১/-
তি. গো. ভ. ৩৫	(নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৩৬	(টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৩৭	(ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৮	(উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৩৯	(বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪০	(অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)	৪২/-
তি. গো. ভ. ৪১	(নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)	৪৩/-
তি. গো. ভ. ৪২	(এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৪৩	(আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৪	(প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৪৫	(বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৬	(আমি রবিন বলছি, উল্কির রহস্য, নেকড়ের গুহা)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৪৭	(নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৪৮	(হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)	৩৯/-
তি. গো. ভ. ৪৯	(মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫০	(কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)	৩৬/-
তি. গো. ভ. ৫১	(পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫২	(উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)	৩৭/-
তি. গো. ভ. ৫৩	(মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক)	৪০/-
তি. গো. ভ. ৫৪	(গরমের ছুটি, স্বর্ণদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৫	(রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৬	(হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)	৩০/-
তি. গো. ভ. ৫৭	(ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৫৮	(মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৫৯	(চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬০	(ভুটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্রাভেল, ভুটকি শত্রু)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৬১	(চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬২	(যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর)	৩৩/-
তি. গো. ভ. ৬৩	(ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৪	(মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৫	[illegible]	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৬	(পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৭	(ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৮	(টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+টোঁকি গোয়েন্দা)	৩৫/-
তি. গো. ভ. ৬৯	(পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ)	৩৪/-
তি. গো. ভ. ৭০	(পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু)	৩৮/-
তি. গো. ভ. ৭১	(পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা)	৩৯/-

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

পাথরে বন্দী

রকিব হাসান

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

'দেখো, রবিন, তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে,' গুঙিয়ে উঠল রিনিতা। 'আজ স্কুল ছুটির পর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে বলেছিলে।'

রিনিতা আমার ছোট। আমার খালাত বোন। আমাদের বাড়ি থাকতে এসেছে। কিছুদিন আগে ওর মা মারা গেছেন ক্যান্সারে। ওর বাবা একসঙ্গে নিজের কাজকর্ম আর মেয়ের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেছেন। আমার মা'কে অনুরোধ করেছেন মেয়েটাকে কিছুদিন দেখাশোনা করতে পারবে কিনা। একটু গুছিয়ে নিয়েই আবার তিনি মেয়েকে নিয়ে যাবেন।

রিনিতাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে মা। আমাদের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে।

'আমি কোন কথা দিইনি,' জোর দিয়ে বললাম।

আমার চারপাশ ঘিরে মশার মত ভ্যানভ্যান করতে লাগল রিনিতা। এ মুহূর্তে বিরক্তিকর একটা পোকার মতই লাগল আমার কাছে ওকে। ঢোলা কারগো প্যান্টটা একটানে কোমরের কাছে তুলে দিয়ে হাত নেড়ে মশা তাড়ানোর মত করে তাড়াতে চাইলাম।

'রবিন!' আমার সামনে এসে নাচতে শুরু করল সে। 'কাল রাতে কথা দিয়েছ। তুমি বলেছ, রিনিতা, কাল রাতে স্কুল ছুটির পর আমাকে যা করতে বলবে তা-ই করব।'

গুঙিয়ে উঠলাম। উফ্, কি মিথ্যুক রে বাবা! চিৎকার করে উঠলাম, 'না, কক্ষনো বলিনি! সরো এখন। স্কুলের দেরি হয়ে যাবে।'

'প্লীজ!' কাকুতি-মিনতি শুরু করল সে। 'ছোট ছোট ওই পাহাড়ী জানোয়ারগুলো দেখতে বড় ইচ্ছে করছে আমার।'

'দেখতে ইচ্ছে করছে, না ওগুলোর গায়ে ব্যান্ড ছুঁড়তে মন চাইছে?'

চিড়িয়াখানার জানোয়ারের গায়ে রবারের ব্যান্ড ছুঁড়ে মারা রিনিতার একটা

http://www.murchona.com©

বিরাট আনন্দ। ওগুলো যখন ব্যথা পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে, মজা পেয়ে খিলখিল করে হাসে সে। অবোধ প্রাণীগুলোকে এভাবে কষ্ট দেয়, আমার খুব খারাপ লাগে তখন।

'তা ছাড়া,' আমি বললাম, 'আজকে আমার সময়ও নেই। স্কুল ছুটির পর স্প্রিং কার্নিভালের জন্যে কাজ করতে হবে।'

'ইস্, আবার সেই স্প্রিং কার্নিভাল!' নাক মুখ কুঁচকে ফেলল রিনিতা। 'কি মজা পাও ওসব ফালতু জিনিসে?'

'সেটা তুমি বুঝবে না…'

কথা শেষ হলো না আমার। রাস্তার দিকে চোখ পড়তে আপনাআপনি তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে।

রাস্তা দিয়ে তীব্র বেগে সাইকেল চালিয়ে আসছে টেরিয়ার ডয়েল।

'সরে যাও! সরে যাও!' সে চিৎকার করে উঠল। 'সামনে থেকে সরো! ব্রেক নেই আমার!'

তার দিকে একটা ট্রাক ছুটে আসছে।

আতঙ্কিত চিৎকার দিয়ে রাস্তার পাশে নেমে পড়ল সে।

গর্জন তুলে চলে গেল ট্রাকটা। সরার পথ না দেখে সোজা আমাদের দিকে ছুটে এল টেরি।

'সরো! সরো!' আবার চিৎকার করে উঠল সে।

শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষে শাঁই করে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে সরে গেল অন্য দিকে।

দম বন্ধ করে ফেলেছে রিনিতা। আমার হাত আঁকড়ে ধরেছে।

'কি করলে এটা?' চেঁচিয়ে উঠলাম টেরির দিকে তাকিয়ে। 'আরেকটু হলেই তো গায়ে পড়তে।'

খিকখিক করে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল টেরি।

'তারমানে ব্রেক নেই কথাটা বিশ্বাস করে ফেলেছিলে?' দাঁত বের করে হাসছে টেরি। 'তোমাকে ভয় দেখানোটা বড়ই সহজ।'

'অন্যকে ভয় দেখানোর রোগে ধরেছে তোমাকে। একবার মুসাকে, একবার আমাকে…আজই গিয়ে ডাক্তার দেখাও। আরেকটা কথা শুনে রাখো, ভয় আমি পাইনি।'

'আসলে, সানগ্লাসের কাচটা এতই কালো ওর, চোখেই দেখতে পায় না,'

খোঁচা দিয়ে বলল রিনিতা।

গর্বিত ভঙ্গিতে সানগ্লাসটা নাকের ওপর ঠেলে দিল টেরি। 'খুব পছন্দ হয়েছে, তাই না? সত্যি ভাল জিনিস। বাবা দিয়েছে। একশো ডলার দাম।'

'অকারণে তোমার মত একটা ছেলের পেছনে টাকা নষ্ট করেন তোমার বাবা,' ফোড়ন কাটল রিনিতা।

কালো কাঁচের আড়ালে টেরির চোখটা জ্বলে উঠল কিনা বোঝা গেল না, তবে আর দাঁড়াল না সে। ঝটকা দিয়ে প্যাডালে পা তুলে চাপ দিল।

রাস্তার পাশে কয়েক ফুট দূরে ওটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম আমি এতক্ষণে। ছোট একটা প্রাণী। নড়ছে।

একটা পাখি। ওটার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিতে যাচ্ছে টেরি।

'টেরি, থামো, থামো!' চিৎকার করে উঠলাম।

থামল না সে।

লাফ দিয়ে গিয়ে ওর সীট ধরে টান মারলাম পেছনে।

ঝাঁকি দিয়ে থেমে গেল সাইকেল। 'আরে, কি করছ?' চেঁচিয়ে উঠল সে।

তবে সময় মত থামাতে পেরেছি। চাকায় পিষে পিষ্ট করে ফেলতে যাচ্ছিল পাখিটাকে।

'দেখছ না, ডানা ভেঙে গেছে! আরেকটু হলেই তো দিয়েছিলে ভর্তা করে।'

'মরেই তো গেছে অর্ধেক,' ওটাকে মেরে ফেলার পক্ষে যুক্তি দেখাল টেরি।

হাঁটু গেড়ে পাখিটার পাশে বসে পড়লাম। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে উড়াল দেয়ার চেষ্টা করল ওটা। ভাঙা ডানার জন্যে নড়তেই পারল না।

'বেচারা! আয়, আমার কাছে আয়!' বললাম।

'বেচারা!' মুখ ভেঙচাল আমাকে রিনিতা। 'ন্যাকা! একটা মরা পাখিকে নিয়ে এ সব মরাকান্নার কি হলো?'

ওর কথা কানে তুললাম না। আস্তে করে তুলে নিলাম পাখিটাকে।

'সুবোধ বালক,' ব্যঙ্গ করল আমাকে টেরি।

রিনিতাকে বললাম, 'স্কুলে যাচ্ছ তো, মিস মুরকে বোলো আমার আসতে

একটু দেরি হবে। পাখিটাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। এটার সেবা-যত্ন করা লাগবে।' পাখিটার ছোট্ট মাথায় একটা আঙুল বুলিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভাবিসনে, ভাল হয়ে যাবি তুই।'

'আসলেই এটা সুবোধ বালক,' আমার ওপর ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বলল রিনিতা। 'ধুর্!'

'কথা কম বলো!' ধমকে উঠলাম। অনেকক্ষণ সহ্য করেছি। 'চুপচাপ স্কুলে চলে যাও!'

'আই রবিন, দেখো!' চোখে কালো চশমা থাকায় যেন আরও বেশি পাজি লাগছে টেরিকে। 'সাইকেলের চাকা সবচেয়ে বেশি কোন কাজে লাগে জানো? কোন কিছু পিষে ভর্তা করে দিতে।' আঙুল তুলে একটা কেঁচো দেখাল সে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে রাস্তার নিচের মাঠে নেমে যাওয়ার জন্যে। মুহূর্তে গিয়ে ওটার গায়ে সামনের চাকা তুলে দিল সে।

'টেরি!' চিৎকার করে উঠলাম। 'অকারণে মারলে কেন বেচারাকে!'

হাসতে হাসতে চাঁদি উড়িয়ে দেয়ার জোগাড় হলো টেরি আর রিনিতার।

'এহ্, আদিখ্যেতার চূড়ান্ত!' নাক কুঁচকে বলল রিনিতা।

'আদিখ্যেতা তো তোমরা করছ,' জবাব না দিয়ে আর পারলাম না। 'জগতে প্রতিটি প্রাণীরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে, হোক না সেটা সামান্য কেঁচো।'

আমার ক্ষুদ্র বক্তৃতা হাসি আরও বাড়িয়ে দিল ওদের।

'হাসো, হাসো, যত খুশি হেসে নাও,' সাবধান করলাম ওদের। 'কেউ যেদিন তোমাদের এ ভাবে পিষে ভর্তা বানাবে সেদিন বুঝবে ব্যাপারটা মজার নয় মোটেও।'

আমার কথা শুনে হাসতে হাসতে বাঁকা হয়ে গেল টেরি।

'মাগো! কি ভয় পেয়েছি গো!' চোখ বড় বড় করে মুখ ভেঙচে বলল রিনিতা। টেরির সঙ্গে যোগ দিল। কারণ সে-ও জন্তু-জানোয়ারকে কষ্ট দিয়ে মজা পায়।

পাখিটাকে নিয়ে বাড়ি রওনা হলাম। একটা প্রাণী মারা যাচ্ছে, তাতে এত হাসির কি হলো ওদের, বুঝলাম না। হয়তো বাড়াবাড়িই করছি আমি, কে জানে! কিন্তু কেয়ার করলাম না। যেটা উচিত মনে হয়েছে সেটাই করছি।

'দেরি করে ফেলার জন্যে দুঃখিত, মিস মূর,' ঘণ্টাখানেক পর স্কুলে ফিরে বললাম আমি।

ক্লাসের সবগুলো চোখ আমার দিকে। জানালার কাছে বসা কিশোর আর মুসাও তাকিয়ে আছে।

হাসলেন মিস মূর। 'রিনিতা আমাকে বলেছে সব। পাখিটা কেমন আছে?'

'মনে হয় ভাল হয়ে যাবে। মা বলেছে, বিকেল বেলা পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে।' নিজের সীটে বসলাম।

'ভাল। যা করেছ, সেটা তোমার দায়িত্বজ্ঞানেরই পরিচয়, রবিন।' আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস মূর। হাসিটা সুন্দর। নিখুঁত সাদা দাঁত। হাসার সময় চোখ দুটোও হাসে।

'কিছু কাজ আছে, সময় মত স্কুলে হাজির হওয়ার চেয়েও জরুরী,' তিনি বললেন। 'যেমন, একটা জীবন বাঁচানো। হোক না সেটা সামান্য পাখির।'

মিস মূরের বয়েস কম। সুন্দরী। চকচকে সোনালি চুলগুলো কাঁধের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

আমার দিক থেকে চোখ ফেরালেন তিনি। সমস্ত ক্লাশকে বললেন, 'তোমাদের লেখা এবারকার ছোট গল্পগুলো সবই ভাল হয়েছে। কিছু কিছু তো খুবই ভাল। রবিন, বিশেষ করে তোমারটা।'

আমাদের কাগজগুলো ফেরত দিতে শুরু করলেন তিনি। আমারটা দেয়ার সময় তাঁর হাতের দিকে চোখ পড়ল। নতুন একটা আঙটি। চমৎকার সাদা পাথর বসানো। অনেক বড় পাথর। কোনও ধরনের রত্ন, তবে সেটা কি বুঝতে পারলাম না।

আমাকে আঙটিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসলেন মিস মূর। 'খুব সুন্দর, তাই না? এ রকম আঙটি জীবনেও দেখিনি আমি।' আমার চোখের সামনে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'দেখো, কি রকম অদ্ভুত।'

মনে হলো কি যেন রয়েছে পাথরটার ভেতরে। ভাল করে তাকিয়ে চমকে গেলাম। 'মিস মূর! ভেতরে কিছু আছে! জ্যান্ত কিছু!'

দুই

ধোঁয়ার মত জিনিস নড়ে বেড়াচ্ছে পাথরের মধ্যে।

বেশি আলোতে পাথরটা নিয়ে গেলেন মিস মূর। ধোঁয়াটা একটা মুখের মত লাগল। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে যেন।

কেঁপে উঠলাম। শয়তানের মুখের মত লাগছে আমার কাছে মুখটা।

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'পাথরের খুঁত,' মিস মূর বললেন। 'আলোয় তুলে ধরলে মুখের মত মনে হয়। তাই না?'

মাথা ঝাঁকালাম। চোখ সরাতে পারছি না আঙটিটা থেকে। ভেতরের মুখটা বড়ই কুৎসিত। ভয়ঙ্কর।

'অদ্ভুত দৃষ্টিবিভ্রম,' যেন নিজেকেই বোঝালেন মিস মূর। 'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

ঢোক গিললাম। 'পছন্দ হয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে চোখ সরাতে পারছি না, এটা ঠিক।'

হাসলেন তিনি। 'ঠিক এই সমস্যাটা আমার বেলায়ও হচ্ছে।'

'কোন্ দোকান থেকে কিনলেন?' জানতে চাইলাম।

'দোকান থেকে কিনিনি। পার্কিং লটে পড়ে ছিল। তুলে নিলাম। ভাবলাম, স্কুলেরই কারও হবে। আমার আঙুলে দেখতে পেলে বলবে। দিয়ে দেব।'

'কেউ বলেছে?'

'না। তবে চাইলেই এখন দিতে পারতাম না। খুলতেই পারি না আঙুল থেকে। আটকে গেছে।'

টেনেটুনে দেখালেন তিনি। সত্যি খোলা যাচ্ছে না। গাঁটে আটকে যায়। 'পরার সময় কোন অসুবিধে হয়নি, হড়হড় করে ঢুকে গেল। খুলতে গিয়ে দেখি ছোট হয়ে গেছে যেন রিঙটা।'

পরার সময় বড় থাকে, পরার সঙ্গে সঙ্গে ছোট হয়ে যায় আংটি, এমন

অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি। তবে আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সরে গেলেন মিস মূর। যার যার খাতা দিয়ে ফিরে গেলেন নিজের ডেস্কের কাছে। বললেন, 'আমি জানি, স্প্রিং কার্নিভালের জন্যে তৈরি হচ্ছ তোমরা। প্রচুর কাজ। সে-জন্যে ভাবলাম,' থেমে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি, 'এ সপ্তাহের ছুটিতে আর কোন হোমওঅর্ক দেব না তোমাদের।'

হই হই করে উঠল সারা ক্লাস। মিস মূরের তুলনা হয় না।

শান্ত হয়ে এল ক্লাস। ভূগোল পড়তে তৈরি হলাম আমরা। চকবোর্ডে একটা ম্যাপ টানিয়ে দিলেন মিস মূর।

আলো লেগে ঝিক করে উঠল আঙটিটা। ভেতরের মুখটার কথা ভাবতে লাগলাম আমি।

নাহ্, অকারণে ভাবছি। এর ভেতরে কোন রহস্য নেই। অতি সাধারণ একটা খুঁত। আর কিছু না।

ধোঁয়াটে খুঁত। মুখের মত দেখতে।

নড়াচড়া আসলে করে না, কিন্তু মনে হয় করে।

কিন্তু এত কুৎসিত কেন?

মন থেকে তাড়াতেই বা পারছি না কেন?

তিন

'আমি একটা গাধা!' ধমক লাগালাম নিজেকে। রাগ করে রঙের তুলিটা ছুঁড়ে ফেললাম টেবিলের ওপর। আঁকতে যাচ্ছি ফুল, হয়ে যাচ্ছে মুখ। বীভৎস একটা মুখ।

আর্ট রুমে কাজ করছি আমরা। কারনিভালে বিক্রির জন্যে ছবি আঁকতে বসেছি। ছবি আর অন্যান্য শিল্পকর্ম বিক্রির দায়িত্বে আছি আমি। খাবারের দোকানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মুসাকে। এ ছাড়া বাকি যা আছে, সব কিছুর ইন-চার্জ কিশোর।

আমাদের ক্লাসের সবাই কিছু না কিছু তৈরি করছে বিক্রির জন্যে।

আমার আঁকা ছবিটার দিকে তাকালাম আবার। এ জিনিস কেউ কিনতে চাইবে না।

কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল কে যেন। ফিরে তাকিয়ে দেখি, টেরি। আমি তাকাতেই বলে উঠল, 'বাহ্, দারুণ এঁকেছো তো। বাঁদর, তাই না?'

কান লাল হয়ে যাচ্ছে আমার। ফিরে তাকালাম কিশোর আর মুসা কি করছে দেখার জন্যে। কাদা দিয়ে কি যেন তৈরি করছে কিশোর। মুসা গালে হাত দিয়ে কতগুলো কাগজের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছে। খাবারের তালিকা নিশ্চয়।

'নাকি ছাগলের মাথা?' আবার জিজ্ঞেস করল টেরি। 'বাহ্, শিঙে আবার ফিতেও পরিয়েছো দেখছি।'

'এতই ভাল পারো যদি, নিজে গিয়ে আঁকো না কেন?' ঝাঁজিয়ে উঠলাম।

'তাই তো করেছি।' হাসি ছড়িয়ে গেল টেরির মুখে। 'ভাবলাম, তোমার খুব পছন্দ হবে। সে-জন্যেই তো দেখাতে আনলাম।'

হাতের কাগজটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরল সে। একটা ছেলের মুখ আঁকা। তাতে দুটো বড় বড় গাধার কান। ঘাড়ের কাছে কেশরের মত কিছু রোমও আছে। মুখটার সঙ্গে আমার চেহারার মিল।

'আমার পেছনে লেগেছ কেন!' রাগ করে বললাম।

'বাহ্, চিনতে তাহলে পেরেছ,' হাসিটা বাড়ল টেরির। 'তারমানে আর্টিস্ট হিসেবে আমি খারাপ না।'

ঢোক গিললাম। আমার চেহারা চিনতে পেরেছি বললে ওরই জিত হবে। মজা পাবে। সেটা পেতে ওকে আমি দেব না। তাই বললাম, 'না চেনার কি হলো? তোমার মুখ কে না চেনে? এক কাজ করো, একটা কালো চশমা এঁকে দাও নাকের ওপর, নিখুঁত হয়ে যাবে। কিন্তু কথা সেটা না, কথা হলো আমাকে দেখাতে এনেছ কেন?'

আমার আর টেরির মাঝে কথা কাটাকাটি হচ্ছে বুঝতে পেরেই বোধহয় একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'কি ব্যাপার? ঝগড়া করছ নাকি?'

'উঁহু,' মাথা নাড়লাম। 'টেরি তার নিজের ছবি এঁকেছে তো। কেমন হয়েছে দেখাতে এনেছে আমাকে।'

'অ, তাই নাকি? দেখি, দেখি। হয়েছে ভালই, তবে সামান্য খুঁত আছে,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর।

মুসাও চলে এসেছে ততক্ষণে। ছবিটা দেখে বলল, 'স্বাস্থ্যটা বেশি ভাল আঁকা হয়ে গেছে। আরেকটু শুঁটকি শুঁটকি হলে ভাল হতো।'

'খবরদার! বাজে কথা বলবে না!' গর্জে উঠল টেরি।

'আরি, বাজে কথা বললাম কোথায়?' অবাক হওয়ার ভান করল মুসা। 'যা এঁকেছ তাই তো বললাম। যদি বলো, আরও জীবন্ত করে তুলতে পারি। জেলেদের কাছ থেকে শুঁটকি এনে ঘষে দিতে পারি এর ওপর। তাতে চেহারা দেখার সঙ্গে শুঁটকির গন্ধও পাওয়া যাবে।'

মুসার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টেরি। ঝাঁকি লেগে চশমাটা খুলে গিয়ে মেঝেতে পড়ল। ধস্তাধস্তি শুরু হলো দু'জনের।

'আরে কি হলো! ও কি করছ!' ধমক দিতে দিতে এগিয়ে এলেন স্কুলের আরেক টিচার মিস্টার হোমার। 'মারামারি করছ কেন? পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

টেনেটুনে আলাদা করলেন দু'জনকে।

'কথা নেই বার্তা নেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে ও!' বিচার দিল টেরি।

'মিথ্যে কথা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ও আগে আমার গায়ের ওপর পড়েছে!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' মিস্টার হোমার বললেন। 'কে আগে পড়েছে সেটা জানার দরকার নেই। দু'জনেরই দোষ। নিজেদের জায়গা ছেড়ে উঠে এলে কেন? যাও, যার যার জায়গায়। ক্লাসের মধ্যে আবার যদি এ রকম করতে দেখি, সোজা প্রিন্সিপালের কাছে পাঠাব।'

'ওই শুঁটকিটা একটা চিরযন্ত্রণা হয়ে দাঁড়াল,' রাগ কমানোর জন্যে বার্গারে বিরাট এক কামড় বসাল মুসা। 'এর একটা বিহিত করা দরকার।'

স্কুলের ক্যাফিটেরিয়ায় লাঞ্চ করতে বসেছি আমরা তিনজনে।

'কি আর বিহিত করবে?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। সামনের প্লেট থেকে তার বার্গারটা তুলে নিল। 'স্কুল ছেড়ে চলে গেলে পারি। নইলে ও এমন করতেই থাকবে, আমরাও তার জবাব দিতে থাকব।'

'তা-ই করব। দেখাই যাক না, কতদিন পারে সে…'

মুসার কথা শেষ হলো না, তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে।

'খাইছে! কি হলো?' লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

হাত তুলল কিশোর। 'ওদিক থেকে এসেছে।'

ক্লাসের দিকে দৌড় দিলাম আমরা।

চকবোর্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম মিস মূরকে। চোখ-মুখ কুঁচকানো। আতঙ্কিত।

'কি হয়েছে, মিস মূর?' জানতে চাইল কিশোর। 'কি ব্যাপার?'

চার

নীরবে হাত তুলে চকবোর্ডটা দেখালেন মিস মূর।

প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা লেখায় ভরা। কে যেন বোর্ড জুড়ে একই কথা লিখে গেছে: কারনিভাল খতম! কারনিভাল খতম! কারনিভাল খতম!

'খাইছে! এটা কি?' চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মুসা।

'কার কাজ?' আমি বললাম।

মিস মূরের মুখ দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবেন। 'আমি জানি না!' ককিয়ে উঠলেন তিনি। 'মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে বেরিয়েছিলাম। এসে দেখি এই।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

আমিও তাকিয়ে আছি। মনে হলো বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন মিস মূর। বোর্ডে কেউ যদি কিছু লিখেই গিয়ে থাকে, তাঁর এত ঘাবড়ে যাবার কি হলো?

নিশ্চয় কিশোরও আমার মতই ভাবছে।

চকবোর্ডের দিকে তাকাল সে। 'কেন লিখল?'

'নিশ্চয় কেউ রসিকতা করেছে আমার সঙ্গে,' মিস মূর জবাব দিলেন।

'যদি রসিকতা না হয়?' আমি বললাম। 'যদি সত্যিই বলে থাকে?' কিশোরের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ফিরলাম মিস মূরের দিকে।

'কারনিভালে গণ্ডগোল করার প্ল্যান করে থাকে যদি কেউ?'

মাথা নাড়তে লাগলেন মিস মূর। আতঙ্কিত ভাবটা চলে গেছে তাঁর। 'আমার তা মনে হয় না। কেউ আসলে আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছে।'

'যা-ই হোক, বোর্ডটা এখন মুছে ফেলা দরকার,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক,' আমি বললাম। 'চলো, মুছে ফেলি।'

'থ্যাংক ইউ,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মিস মূর। 'তোমাদের মত ভাল ছেলে আর হয় না।'

একটা ইরেজার তুলে নিলাম আমি। আরেকটা ছুঁড়ে দিলাম কিশোরের দিকে। জোরে জোরে ঘষে মুছতে শুরু করলাম লেখাগুলো।

কারনিভাল খতম! কারনিভাল খতম!

আমার মগজের মধ্যে ঘুরতেই থাকল কথাগুলো। কি মানে এগুলোর?

আমার জানামতে সবাইই তো স্প্রিং কার্নিভাল ভালবাসে। তাহলে এ ধরনের কথা কে লিখে গেল চকবোর্ডে?

'বাহ্, সবাই দেখছি এখানে,' বলতে বলতে ঘরে ঢুকল টেরি। 'এত হই-চই কিসের?'

'কে জানি উল্টোপাল্টা লিখে গেছে চকবোর্ডে।' টেরির দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর, 'তোমার কাজ না তো?'

'না না, আমি করব কেন?' হাত তুলে নাড়তে লাগল টেরি। 'চকে আমার সাংঘাতিক অ্যালার্জি। চকের গুঁড়ো নাকে ঢুকলে হাঁচি দিতে দিতে জান শেষ।'

ওর দু'হাতের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কিশোর।

আমিও দেখতে পাচ্ছি।

দু'হাতের তালুতেই চকের গুঁড়ো মাখা।

পাঁচ

'কি-কি হলো! আমার দিকে ওরকম করে তাকিয়ে আছো কেন?' ঝট করে দুই হাত পেছনে নিয়ে গেল টেরি।

'তোমার হাতে চক লেগে আছে,' মুসা বলল।

কঠিন দৃষ্টিতে টেরির দিকে তাকিয়ে আছেন মিস মুর।

দরজার দিকে পিছিয়ে যেতে শুরু করল টেরি।

'না না, চকের গুঁড়ো না!' চিৎকার করে উঠল সে। 'চক না...কাদা! আর্ট ক্লাস শেষ হলে মিস্টার হোমারকে কাদা মুছতে সাহায্য করেছি।'

'হ্যাঁ, তাই তো,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর, 'তুমি সাহায্য না করলে কে করবে! তুমি তো সাহায্য করার ছেলেই বটে...'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই 'আমি যাই,' বলে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল টেরি।

'হাত থেকে চকের গুঁড়ো ধুয়ে ফেলতে গেল,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, তাই,' কিশোরের সঙ্গে একমত হলাম আমি। 'কারনিভালের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিল যে, সেটা দেয়া হয়নি বলেই পণ্ড করার চেষ্টা করছে।'

'হ্যাঁ, হিংসাতেই এমন করছে।'

মাথা নেড়ে মিস মুর বললেন, 'টেরি এমন একটা কাণ্ড করবে, বিশ্বাস করতে পারছি না আমি!'

কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। এ ধরনের শয়তানি সব সময়ই করে টেরি।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমাকে পাগল বানিয়ে ফেলতে শুরু করল রিনিতা।

'পুতুলগুলো সাজাতে আজ আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমাকে!' ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করল সে। 'লাইন ধরে সাজাতে চাই, সুন্দরটা থেকে শুরু করে কুৎসিতটা।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললাম, 'রিনিতা, বারবি পুতুল সবই সুন্দর।'

'কে বলল তোমাকে? সার্ফার বারবি খুবই সুন্দর, আবার সারফার বারবিগুলোকে দেখতে মোটেও ভাল না।'

'তাহলে নিজেই সাজাওগে। স্কুলে যেতে হবে আমাকে। অনেক কাজ।'

'মিথ্যুক কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল রিনিতা। 'আজ তো রোববার।'

'ক্লাস করতে কি আর যাব। যাব কার্নিভালের কাজ করতে।'

কাজ এখনও শেষ হয়নি আমাদের। তা ছাড়া আর্ট বিক্রির দায়িত্বটা

আমার ওপর থাকাতে তদারকিরও প্রয়োজন আছে।

'কিন্তু তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে!' চিৎকার করে উঠল রিনিতা।

'কখন কথা দিলাম তোমাকে?'

'তুমি মিথ্যুক!' সমান তালে চিৎকার করে উঠল রিনিতা। 'কোন কথাই রাখ না তুমি!'

'দিলে তো রাখব।'

'কার্নিভাল না ঘোড়ার ডিম! তোমার সবটুকু সময় খেয়ে নিল। আমার গরুর চোখটার কি হবে?'

'গরুর চোখ মানে?'

'অ, সেটার কথাও ভুলে গেছ। সাইন্স ক্লাসে টিচার বলেছে যার যার বিষয় তাকে বেছে নিতে। আমি ঠিক করেছি গরুর চোখ কেটে দেখব তার ভেতরে কি আছে। আর তুমি আমাকে সাহায্য করবে কথা দিয়েছ।'

'জানিই না যেটার কথা সেটার জন্যে কথা দেব কি করে? গরুর চোখ পেলে কোথায়?'

'এক হপ্তা ধরেই তো আছে আমার ঘরে। নেড়ি কাউসনের কাছ থেকে কিনেছি।'

নেড়ি কাউসন রিনিতার ক্লাসে পড়ে। ওর বাবা ল্যাবরেটরিতে কোনও ধরনের গবেষণার কাজ করেন। নানা রকম উদ্ভট জিনিস এনে দেয় রিনিতাকে নেড়ি।

'হুঁ,' বললাম, 'কাউ-এর চোখ কাউসন এনে না দিলে আর কে দেবে? খেয়েদেয়ে কাজ নেই তো আমার, গরুর চোখ কাটতে বসি। যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে পাগল তুমি। রিনিতা, সাফ বলে দিচ্ছি, এ সব অকাজ-কুকাজ আমাকে দিয়ে হবে না।'

আর কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম।

চিৎকার শুরু করে দিল রিনিতা, 'বোঝাব মজা! তোমাকে আমি ছাড়ব ভেবেছ! সুযোগ আমার আসবেই, দেখো!'

জবাব দিলাম না। রাগ দেখানোর জন্যে প্রচণ্ড শব্দ করে দরজা লাগাল সে।

রান্নাঘরে নেমে এলাম। ফিরে তাকাল মা। রিনিতার চিৎকার শুনতে পেয়েছে। 'অকারণে মেয়েটাকে খোঁচাস কেন?'

'রিনিতার স্বভাব তোমার জানা, মা। ওকে কি খোঁচানো লাগে?'

'কিছু একটা করে দিতে বলেছে নিশ্চয়। করে দিলেই পারিস?'

'তাই বলে সাত দিনের পচা গরুর চোখ কাটতে বসব ওর সঙ্গে?'

'মানে!'

খুলে বললাম।

শুনে গম্ভীর হয়ে গেল মা। 'ওর বাবা এলে বলতে হবে। ডাক্তার দেখানো দরকার।'

'কিছুই দেখানোর দরকার নেই,' ঝাঁজিয়ে উঠলাম। 'ও ঠিকই আছে।...পাখিটার কি করলে, মা? ডাক্তারের কাছে নিয়েছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল মা। 'ডানায় স্প্লিন্ট লাগিয়ে দিয়েছে। ছোট একটা খাঁচাও কিনেছি পাখিটার জন্যে। পেছনের বারান্দায় রেখেছি।'

দেখতে গেলাম। শান্ত হয়ে খাঁচায় বসে আছে পাখিটা। একধারে ছোট একটা বাটিতে পাখির দানা রেখে দিয়েছে মা। খাবারগুলো তেমনি পড়ে আছে। খায়নি বিশেষ।

'কেমন আছিস, ছোট্ট পাখি?' আদর করে জিজ্ঞেস করলাম। 'তোর ভাঙা ডানাটা কেমন এখন?'

ওর ডানায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ভারী হয়ে আছে। ভাল থাকার কথা না। বেচারা।

একটা নাম দিতে ইচ্ছে হলো ওকে। নাম দিলাম ডরোথি। ক্লাসিক ফ্যান্টাসি 'উইজার্ড অভ ওজ' বইয়ের প্রধান চরিত্র ডরোথির কথা এ মুহূর্তে মাথায় এল কেন, বুঝলাম না, তবে সেই চমৎকার মেয়েটার নামটা দিতেই ইচ্ছে করল পাখিটাকে।

বারান্দায় বসে খানিকক্ষণ দেখলাম পাখিটাকে। মনে হলো এই অসুখের সময় ওকে সঙ্গ দেয়া উচিত।

একটু পর মা ডেকে বলল, লাঞ্চ দেয়া হয়েছে। আমি ঘরে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল, 'পাখিটা কেমন আছে?'

'ভাল না,' জবাব দিলাম।

'কাল নাগাদ ভাল হয়ে যাবে,' মা বলল। রিনিতাকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'রিনি, রবিনের পাখিটা দেখেছিস?'

'ওর গায়ে সাইকেলটা চালিয়ে দিলেই ভাল করত টেরি,' বিড়বিড় করল

রিনিতা। মুখটা গোমড়া করে রাখল।

'এ রকম কথা বলতে পারলে তুমি!' না রেগে পারলাম না।

'তোমার সঙ্গে কে কথা বলে!'

'ভাল,' জবাব দিলাম। 'তোমার কথা আমি শুনতেও চাই না। যতটা কম কানে আসবে, শান্তিতে থাকব।'

'আহ, থামবি তোরা!' ধমক দিল মা।

লাঞ্চের বাকি সময়টা মোটামুটি শান্তিতেই কাটল। মা'র সঙ্গেই মূলত কথা বললাম আমরা। রিনিতাকে পারতপক্ষে এড়িয়ে গেলাম।

'তোর বাবার আসতে নাকি আরও দিন দশেক দেরি হবে,' মা জানাল আমাকে। 'রিপোর্টগুলো শেষ না করে আসবে না।'

আমার বাবা খবরের কাগজে কাজ করে। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয় তাকে। নিউ ইয়র্ক গেছে দিন পনেরো আগে।

লাঞ্চ সেরে নিজের ঘরে চলে এলাম। স্কুলে যাওয়ার জন্যে রেডি হতে হবে।

সোয়েটারটা সবে হাতে নিয়েছি, ফোন বাজল। আমার ঘরেও একটা বাড়তি সেট আছে।

তুলে নিলাম। 'হালো?'

'দূরে থাকবে!' অদ্ভুত একটা কণ্ঠ চাপা স্বরে ফিসফিসিয়ে বলল। যেন নিজের আসল কণ্ঠটা লুকিয়ে রাখতে চায়। তারমানে পরিচিত কেউ।

'দূরে থাকবে! তোমাকে সাবধান করা হচ্ছে! স্কুলে যাবে না আজ!'

ছয়

'হালো? কে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'টেরি নাকি?'

কট করে শব্দ হলো।

কেটে গেল লাইন।

বিছানায় বসে পড়লাম। ভাবছি। গতকালের মিস মুরের চকবোর্ডের

লেখাটার কথা।

কারনিভাল খতম!

সত্যিই টেরির কণ্ঠ?

বলা কঠিন। যে কেউ হতে পারে। রিসিভারে রুমাল চাপা দিয়ে কথা বললে সহজে কণ্ঠস্বর চেনা যায় না।

রিনিতার ঘর থেকে খিলখিল হাসি শোনা গেল।

সর্বনাশ! রিনিতাই মজা করে আমাকে এক হাত নিল না তো?

ঝড়ের গতিতে ছুটে বেরোলাম ঘর থেকে। বিছানায় বসে পা দোলাচ্ছে। কর্ডলেস টেলিফোনটা চেপে রেখেছে কানে।

'রিনিতা! তুমি নাকি?' ভীষণ রেগে গেলাম।

'আস্তে!' আমার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকাল রিনিতা। 'কথা বলছি দেখছ না?'

'এইমাত্র তুমি আমাকে ফোন করেছ, তাই না?' আরও রেগে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'তোমাকে ফোন করতে যাব কেন?' রিনিতাও রেগে উঠল। 'কথা বলতে চাইলে তো ঘরেই যেতে পারতাম। ফোন করার কষ্ট করব কেন?...হ্যালো, হ্যাঁ...নেড়ি, পরে কথা বলব।'

'নেড়ির সঙ্গে কথা বলছিলে, সত্যি? নাকি ফোন অফ করে রেখে কথা বলার ভান করেছ?'

'ভান করতে যাব কোন দুঃখে?' হঠাৎ কি মনে হতেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। 'তুমি মনে হচ্ছে এখন অবসর। পুতুলগুলো সাজাতে সাহায্য করবে?'

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম রিনিতার দিকে। মেয়েটা সত্যি পাগল!

আমার ধারণা, ফোনটা ও-ই করেছে। ভয় দেখিয়ে আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে পারলে আমি বাড়িতে থাকব। আমাকে দিয়ে কাজ করাতে পারবে, কিংবা আমার সঙ্গে খেলতে পারবে, এই আশায়।

'আমি তোমার চালাকির ফাঁদে পা দিচ্ছি না,' বলে ঘরে ফিরে এলাম।

কিশোরদের বাড়িতে রওনা হলাম।

স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেট দিয়ে ঢুকে কিশোরের ব্যক্তিগত ওঅর্কশপটায়

উঁকি দিলাম। ওখানে নেই। শোবার ঘরে পাওয়া গেল। স্কুলে যেতে চাই, জানালাম ওকে। কাজগুলো শেষ করে ফেলা দরকার।

'আমার আজকে স্কুলে যেতে ইচ্ছে করছে না,' আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল কিশোর। 'ভাবছিলাম, সাইকেল নিয়ে পাহাড়ের দিক থেকে বেড়িয়ে আসব।'

'তাহলে তো খুবই ভাল হয়,' খুশি হয়ে বললাম। 'চলো আগে স্কুলে যাই। কাজ সারতে দেরি হবে না। তারপর দু'জন একসঙ্গেই নাহয় বেরোব। মুসা যেতে চাইলে তাকেও নেয়া যাবে।'

বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে।

স্কুলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম কেয়ার-টেকার মিস্টার টনিংকে। হাতে চাবির গোছা।

আমাদের দেখেই বলে উঠল, 'ঠিক সাড়ে চারটায় বন্ধ করে দেব। তার আগেই কাজ শেষ করবে।'

'হয়ে যাবে,' বললাম আমি।

শনিবারে ছুটির দিনে স্কুলের পরিবেশটা কেমন অদ্ভুত মনে হলো। বড় বড় হলগুলো সব শান্ত, নির্জন। ক্লাসরুমগুলো অন্ধকার।

হলঘর ধরে দ্রুত হেঁটে চললাম আমি আর কিশোর। চকচকে মেঝেতে বিচিত্র শব্দ উঠতে লাগল আমাদের স্নীকারের। আর্ট রুমটা দোতলায়, বিল্ডিঙের পেছনের অংশে।

দরজা লাগানো। জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, এ ঘরটাও অন্ধকার।

'মনে হচ্ছে আমরাই সবার আগে এলাম,' কিশোরকে বললাম।

'দরজায় তালা নাকি? মিস্টার টনিংকে ডাকতে হবে তাহলে।'

দরজার নব ধরে মোচড় দিল কিশোর। খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিলাম আমি।

দিয়েই চিৎকার করে উঠলাম।

সাত

মাথা ঘুরতে লাগল আমার। হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসতে লাগল।

'এ কি কাণ্ড!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঝড় বয়ে গেছে যেন ঘরটার ভেতরে।

টেবিল চেয়ার সব উল্টে ফেলা হয়েছে। দেয়াল থেকে ছিঁড়ে এনে দুমড়ে মুচড়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে ছবিগুলো। দেয়াল, মেঝে রঙে মাখামাখি। সারা ঘরময় কাগজ আর কাঁচের টুকরো।

'সব শেষ করে দিয়েছে!' চিৎকার করে উঠলাম। 'সব, সব শেষ!' পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরেছে আমার। অবশ হয়ে আসছে দেহ।

চিৎকার শুনে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন মিস্টার হোমার। 'এই, কি হয়েছে...'

ঘরের দিকে নজর পড়তে চুপ হয়ে গেলেন তিনি। 'সর্বনাশ!...এ কি কাণ্ড!'

'ঢুকেই দেখি এ অবস্থা,' কিশোর বলল।

'কার কাজ?' ককিয়ে উঠলাম।

'গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছিল না,' মিস্টার হোমার বললেন, 'সেজন্যে আসতে দেরি হয়ে গেল আমার। যে কাজটা করেছে, আমার আসার আগেই করেছে। আমাদের স্কুলের কেউ করেছে, বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

জঞ্জালের মধ্যে খুঁজতে শুরু করলাম। অক্ষত কিছু অবশিষ্ট থাকলে উদ্ধারের চেষ্টা করব। কয়েক টুকরো কাগজের মধ্যে একটা টুকরো দেখে চিনতে পারলাম।

'আমার আঁকা ছবি ছিল ওটা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম। 'ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করেছে!'

কিশোর খুঁজছে সূত্র। বুলেটিন বোর্ডের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওই দেখো, কি লিখে রেখেছে।'

তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেলাম আমি আর মিস্টার হোমার। সাদা কাগজে লাল কালিতে লেখা রয়েছে: কার্নিভাল খতম!

চট করে একে অন্যের দিকে তাকালাম আমি আর কিশোর।

গায়ে কাঁটা দিল আমার। রসিকতা নয় ব্যাপারটা, বুঝে গেছি। সত্যি সত্যি কেউ কার্নিভালটাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে।

কিন্তু কেন?

'যে এ কাজ করেছে,' নিচের ঠোঁট কামড়াল কিশোর, 'নিশ্চয় এখনও এ বিল্ডিঙেই রয়েছে। খুঁজে দেখা দরকার।'

বাধা দিলেন মিস্টার হোমার, 'উঁহু, যেও না। বিপদ হতে পারে।'

এ সময় একটা জিনিসে দৃষ্টি আটকে গেল আমার।

একটা ছবি ঝুলছে এখনও দেয়ালে। অক্ষত।

একটা ছবি। মাত্র একটা।

অস্ফুট চিৎকার নিজের অজান্তেই বেরিয়ে এল মুখ থেকে। বিশ্বাস করতে পারছি না।

'কি ব্যাপার?' শঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'কি হয়েছে?'

'ছ-ছ-ছবিটা!' তোতলাতে শুরু করলাম। 'ওই একটা ছবি দেয়ালে ঝোলানো কেন?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর। 'নিশ্চয় চোখ এড়িয়ে গেছে যে নষ্ট করেছে তার।'

'উঁহু,' মাথা নাড়লাম আমি। 'সে-জন্যে বলছি না। ছবিটা টেরির আঁকা।'

আট

তাকিয়ে রইলাম ছবিটার দিকে। ছেঁড়া হয়নি। আস্ত রয়েছে। অক্ষত।

ছেঁড়েনি। তবে একটা জিনিস যুক্ত করেছে ছবিটাতে। নতুন করে এঁকে দিয়েছে। আমার মুখ থেকে রক্ত বেরোচ্ছে।

'আই! কি হয়েছে?' দরজার কাছ থেকে শোনা গেল টেরির কণ্ঠস্বর।

ফিরে তাকালাম ওর দিকে। রাগে যে চোখ জ্বলছে আমার, স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

'কি ব্যাপার?' মেঝেতে ছড়ানো জঞ্জালের দিকে অবাক চোখে তাকাতে লাগল সে। অভিনয় ভালই করতে পারে। 'কে করেছে এ সব?'

'তুমি করেছ!'

'আমি করিনি!' চিৎকার করে উঠল সে। 'আমি তো মাত্র এলাম।'

'তাহলে শুধু তোমার ছবিটাই ঝোলানো কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তা কি করে বলব? হতে পারে, কেউ একজন মূল্য বুঝে গেছে ওটার। চিনতে পেরেছে মহান শিল্পকর্ম।'

'ফাজলেমি কোরো না,' ধমক লাগালেন মিস্টার হোমার। 'ব্যাপারটা সিরিয়াস। পুলিশ ডাকতে হতে পারে।'

অন্য ছেলেমেয়েরা আসতে শুরু করেছে এক এক করে। মুসাও ঢুকল। ঘরের অবস্থা দেখে কেউ শান্ত থাকতে পারল না। সবাই চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল। পুলিশের কথা শুনে টেরিও ভড়কে গেল।

সব সময় কোন না কোন কৈফিয়ত রেডি তার মুখে। হাতে লেগে থাকা চকের গুঁড়োকে বলেছে শুকনো কাদা। এ ব্যাপারে কি জবাব দেয় শুনতে ইচ্ছে হলো।

কার্নিভালটাকে ধ্বংস করে দেয়ার তালে আছে নাকি সে? না যা বলছে সত্যিই বলছে?

'এই থামো সবাই, শোনো!' হট্টগোল থামানোর জন্যে রীতিমত চিৎকার করতে হলো মিস্টার হোমারকে। 'যা হবার হয়েছে। এখন আগে জঞ্জালগুলো সাফ করে ফেলা দরকার।'

একটা ঝাড়ু নিয়ে ঝাঁট দেয়া শুরু করলাম। আমাকে সাহায্য করল মুসা।

আমি তাকে বললাম, 'মুসা, আমার ভয় লাগছে। আমাদের তিনজনকে তিনটে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। সেটাই নিশ্চয় সহ্য হচ্ছে না কারও। হিংসে করে তছনছ করে দিতে চাইছে সব যাতে কার্নিভালটা না হয়।'

জবাব দিতে এক মুহূর্ত দেরি করল না মুসা, 'ঠিক এই কথাটাই আমিও ভাবছি।'

'শনিবারে আর্ট রূমে কি ঘটেছে, সব শুনেছি আমি,' গম্ভীর হয়ে বললেন মিস

মুর, সোমবারের সকালে ক্লাস নেয়ার সময়। ক্লান্ত লাগছে তাঁকে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি মনে হয়।

চুপ করে রইলাম আমরা।

'কার্নিভালের জন্যে ছবি বিক্রি কতটা জরুরী, জানা আছে আমার,' আবার বললেন তিনি। 'সে-জন্যে ঠিক করেছি, আজ আর ক্লাস নেব না। সবাইকে আর্ট রূমে পাঠাব নতুন করে সব তৈরি করে নেয়ার জন্যে।'

আনন্দে হল্লোড় করে উঠলাম সবাই।

আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মিস মুর।

'থ্যাংক ইউ, মিস মুর,' বলে দলবল নিয়ে রওনা হলাম।

দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালাম।

ডেস্কে বসে আছেন তিনি। আঙটিটা আঙুল থেকে খোলার জন্যে টানাটানি করছেন। কুঁচকে রেখেছেন ভুরু।

না পেরে আঙটিটা তুলে নিয়ে এলেন চোখের সামনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁট নড়তে লাগল। বিড়বিড় করে কিছু বলছেন মনে হয়। কথা বলছেন নাকি আংটির ভেতরের মুখটার সঙ্গে!

'এই, রবিন!'

স্কুল ছুটির পর লকারের কাছে এসে ডাকল আমাকে মুসা।

'এত তাড়াতাড়ি বাড়ি না গিয়ে হোম ইকনমিকস ল্যাবে বসে কুকিস বানাব ঠিক করেছি, কার্নিভালের জন্যে,' মুসা বলল। 'কিশোরও থাকবে বলেছে। তুমি থাকবে? মাত্র আর দু'দিন বাকি, একা কুলিয়ে উঠতে পারব না।'

'চলো, যাচ্ছি,' নির্দ্বিধায় জবাব দিলাম। বাড়ি যাওয়ার তাড়া নেই আমার। কোন আকর্ষণও নেই। বরং বিরক্ত করার জন্যে রিনিতা বসে আছে। গেলেই হয়তো ঘ্যান ঘ্যান শুরু করবে পুতুল সাজাতে অথবা গরুর চোখ কাটতে সাহায্য করার জন্যে।

মুসার সঙ্গে হোম ইকনমিকস ক্লাসে এসে ঢুকলাম। কিশোর ততক্ষণে বড় একটা গামলায় ময়দা গুলিয়ে ফেলেছে। বড় কাঠের হাতা দিয়ে জোরে জোরে নাড়ছে।

দরজার কাছে চলে এসেছেন হোম ইকনমিকসের টিচার মিসেস ওরিগন।

আমাদের দেখে হাসলেন, 'হাই, বয়েজ। তোমরা কাজ করো। আমি একটা জরুরী ফোন সেরে আসি।'

তাড়াহুড়ো করে চলে গেলেন তিনি।

বড় একটা গামলায় ময়দা ঢালল কিশোর। তাতে পানি দিয়ে একটা কাঠের হাতা তুলে নিয়ে খোঁচানো শুরু করল।

ময়দা গোলানো হয়ে গেলে একটা কুকি শীটে বিস্কুটের সাইজে রাখতে শুরু করলাম দু'জনে।

মুসা গেল আভন জ্বালতে। নব ঘুরিয়ে ৩৫০ ডিগ্রীতে তুলে দিল।

আমাদের দিকে ফিরে বলল। 'গরম হয়ে গেল বলে।'

একটা কুকি শীট ভর্তি করে আভনে চাপিয়ে দিলাম।

নতুন আরেকটা শীট নিয়ে তাতে ভরা শুরু করলাম।

কয়েক মিনিট পর নাকে এল বিচিত্র গন্ধ।

নাক কুঁচকালাম। 'পুড়ে যাচ্ছে নাকি?'

'নাহ্,' কুকি শীটের দিক থেকে মুখ তুলল না মুসা। 'এত তাড়াতাড়ি পুড়বে কি? হতেই তো কম করে পনেরো মিনিট লাগার কথা।'

বিস্কুটের সুগন্ধ এসে নাকে লাগতে লাগল আমার।

নাকমুখ কুঁচকে কিশোর বলল, 'উঁহ্! ধোঁয়ার গন্ধ!'

ঘুরে তাকিয়ে দেখি আভন থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

'বললাম না পুড়ে গেছে!' চিৎকার দিয়ে দৌড় দিলাম। ন্যাকড়া দিয়ে চেপে ধরে একটানে খুলে ফেললাম আভনের দরজা।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল আগুনের শিখা।

গর্জন করতে লাগল আগুন।

নয়

বরফের মত জমে গেছি।

চিৎকার করার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছি।

চোখের সামনে ঘটতে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না ঘটনাটাকে।

সবার আগে নড়ে উঠল মুসা। আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিয়ে গেল আভনের কাছ থেকে।

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'বেরোও! বেরিয়ে এসো ঘর থেকে!'

দরজার দিকে ঘুরতে টেরিকে দেখতে পেলাম। সরে যাচ্ছে।

টেরি!

এখানে কি করছিল? স্কুল তো ছুটি। বাড়ি যায়নি কেন সে?

দৌড়ে বাইরে এসে স্কুল প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম আমরা। কয়েক মিনিট পরই ঘন্টা বাজিয়ে এসে ব্রেক কষে দাঁড়াল দমকলের গাড়ি। তাড়াহুড়া করে নেমে কর্মীরা ঢুকে গেল বাড়ির ভেতরে।

আরও কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্র হুড়াহুড়ি করে বেরিয়ে এল ভেতর থেকে।

আমাদের কাছে দৌড়ে এলেন মিস মুর। জিজ্ঞেস করলেন, 'অ্যাই, তোমরা ঠিক আছো?'

মাথা ঝাঁকালাম আমরা।

ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাঁকে। ফ্যাকাসে চেহারা। থরথর করে কাঁপছেন।

নিশ্চয় আমাদের জন্যে দুশ্চিন্তায়।

'থ্যাংক গুডনেস!' জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মিস মুর। 'দমকলের শব্দ শুনে তো ভড়কেই গিয়েছিলাম। ভাবলাম না জানি কি হলো! ভাগ্যিস বেশি কেউ ছিল না স্কুলের ভেতর।...কিন্তু প্রিন্সিপাল তো এখনও অফিসেই রয়ে গেছেন!'

ভিড়ের কিনারে টেরিকে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে এগিয়ে গেলাম।

'টেরি,' ভারী গলায় বললাম, 'যখনই কোন অঘটন ঘটছে, আশেপাশে দেখা যাচ্ছে তোমাকে। ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল টেরির। 'তুমি কি ভাবছ আমি করছি এ সমস্ত?'

ওর প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, 'হোম ইকনমিকস ল্যাবেও দেখা গেছে তোমাকে। ওখানে কি করছিলে?'

'কিছু না!' জোর দিয়ে বলল সে। 'ওটার বাইরেই আমার লকার।'

ammsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com©

তোমাদের ওখানে ঢুকতে দেখেছি। ভাবলাম, যাই, দেখি কোন সাহায্য করতে পারি কিনা।'

আহা, এতই দয়ালু! টেরিয়ার ডয়েল! চোখের পাতা সরু করে তাকালাম ওর দিকে।

অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। চকবোর্ডে চক দিয়ে লিখে গেছে কেউ: কার্নিভাল খতম। তারপর ঘরে ঢুকল টেরি। তার হাতে চকের গুঁড়োর মত সাদা কি যেন লেগে থাকতে দেখা গেল।

কেউ একজন আর্ট রুমের জিনিসপত্র সব তছনছ করে দিয়ে গেল, কেবল টেরির ছবিটা বাদে।

আমরা গেলাম বিস্কুট বানাতে। আভনে ধরল আগুন। সেখানেও দেখা গেল টেরিকে।

যখনই কোন অঘটন ঘটছে, ওকে দেখা যাচ্ছে আশেপাশে।

বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এলেন প্রিন্সিপাল। 'আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে,' জানালেন তিনি। 'ক্ষতি তেমন হয়নি। কেউ জখমও হয়নি। সব ঠিক হয়ে গেছে এখন।'

'থ্যাংক গুডনেস!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললেন মিস মূর।

বাড়ি ফেরার পথে অঘটনগুলো নিয়ে মুসা আর কিশোরের সঙ্গে আলোচনা করলাম। মুসার দৃঢ় বিশ্বাস, সব টেরির শয়তানি। কিন্তু কেন যেন টেরির কথা অত জোর দিয়ে বলতে পারল না কিশোর।

ওরা দু'জন যার যার পথে চলে গেলে ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে চললাম আমি। কেউ কি ইচ্ছে করেই আগুনটা লাগাল?

সত্যিই অদ্ভুত! সারা ঘরে লোক বলতে ছিলাম আমি, মুসা আর কিশোর। টেরি ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। তা-ও আগুন লাগার পর।

কে ধ্বংস করতে চাইছে কার্নিভালটা?

এখন পর্যন্ত কেবল জিনিসপত্র নষ্ট করেছে। কথা না শুনলে আমাদের ওপরও হামলা হবে না তো?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, টেলিভিশনে খবর দেখছে মা আর রিনিতা। টিভির সামনে দাঁড়িয়ে আছে মা। হাতের ওপর ঝোলানো তার পার্সটা। রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলছেন আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল।

'রবিন,' দেখেই চিৎকার করে উঠল মা, 'এসেছিস! আমি তো স্কুলে রওনা

হচ্ছিলাম তোদের কি হলো দেখার জন্যে। কিছু হয়নি তো তোদের?'

'না, মা, আমি ভালই আছি,' জবাব দিলাম। 'কারও কিছু হয়নি।'

'ওহ্, খোদা!' ধপ করে একটা কাউচে বসে পড়ল মা।

পেছনের বারান্দায় এসে ঢুকলাম। ডরোথিকে দেখার জন্যে।

আমাকে দেখেই এক ডানা ঝাঁকিয়ে উল্লসিত কিচির মিচির করে উঠল ডরোথি। কে বলে পাখির মগজ দুর্বল? ঠিকই তো চিনতে পারল আমাকে।

'কেমন আছিস, ডরোথি?' খাঁচার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিলাম ওর পিঠে। দুর্বল ভঙ্গিতে এক ডানা ঝাপটাল আবার সে।

হাতের তালুতে কিছু দানা তুলে ওর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। কয়েকটা খুঁটে খেল সে। তারপর ঝিমিয়ে গেল আবার।

নাহ্, অসুখ সারতে দেরি আছে এখনও, ভাবলাম। 'ডরোথি, মনে সাহস আন্। অত নেতিয়ে যাচ্ছিস কেন? আবার সেরে উঠবি তুই। আকাশে উড়াল দিবি।'

দুই আঙুলে টিপে ধরে একটা দানা ওর ঠোঁটের কাছে ধরলাম। 'নে, খা।'

নিল না ও।

নিজের ঘরে ফিরে চললাম। বিধ্বস্ত লাগছে নিজেকে। কি একেকটা সাংঘাতিক দিন যাচ্ছে!

বিছানায় বসে পড়ে জুতো খুলে নিলাম। কানে এল একটা শব্দ।

ধপ্!

জমে গেলাম। কিসের শব্দ?

ঠং!

শব্দটা এল আমার আলমারির ভেতর থেকে। ধড়াস ধড়াস করতে লাগল আমার বুকের মধ্যে।

শান্ত হও, নিজেকে বোঝালাম। কেউ নেই।

আলমারিতে কেউ থাকতে পারে না।

পাথর হয়ে বসে কান পেতে রইলাম। অবাক লাগছে। ভূতের ভয় আমি তেমন পাই না। কিন্তু গত ক'দিনের ঘটনাগুলোয় কি যেন কি হয়েছে আমার, অকারণেই ভয় লাগে।

কিন্তু এই ভয় লাগার পেছনে কারণ কি সত্যিই নেই?

ধুপ!

এত জোরে হলো শব্দটা, ভয়ানক চমকে উঠলাম।

কার্নিভাল খতম! বিদ্যুৎ চমকের মত মগজে ঝিলিক দিয়ে গেল ভাবনাটা।

কেউ যে পিছু লেগেছে আমার, তাতে কোন সন্দেহ রইল না আর।

বসে থাকতে পারলাম না বিছানায়। ভয় লাগলেও প্রচণ্ড কৌতূহল নামিয়ে আনল আমাকে বিছানা থেকে। পা টিপে টিপে এগোলাম আলমারির দিকে।

কাছে যেতেই কানে এল ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ।

'কে? কে ওখানে?' চিৎকার করে উঠলাম।

দশ

ক্যাচকোঁচ করে উঠল আলমারির দরজা।

প্রবল গতিতে চলতে শুরু করেছে আমার হৃৎপিণ্ড। 'কে-কে ওখানে!' চিৎকার করে উঠলাম আবার।

পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি নিজের জায়গায়।

আবার ক্যাঁচকোঁচ করে উঠল আলমারির দরজা।

ঝটকা দিয়ে খুলে গেল।

লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল রিনিতা। 'হাউউ' করে উঠে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

'ভয় দেখালে কেন আমাকে?' চিৎকার করে উঠলাম।

'ও, তারমানে ভয় তুমি পেয়েছ!' আরও জোরে হেসে উঠল রিনিতা। 'যাক, আমার চালাকিটা কাজেই লাগল। কেন দেখিয়েছি জানো? তুমি আমাকে কোনও ব্যাপারে সাহায্য করো না, এ জন্যে।'

'কি করে করব?' রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'দেখো না, আমি কি পরিমাণ ব্যস্ত! তোমার সঙ্গে খেলার সময় কি আমার আছে?'

নরম হলো রিনিতা। 'আগে তা-ও দু'চারটা কাজে সাহায্য করতে। ইদানীং সব একেবারে বাদ দিয়ে দিয়েছ। বাড়িতেই থাকো না, করবে আর

কেমন করে।'

ও নরম হয়ে যাওয়াতে আমারও রাগটা রইল না আর। বললাম, 'তা ঠিক। সরি, রিনিতা। গত ক'টা দিন ধরে যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটছে, মাথা ঠিক রাখাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকাল রিনিতা।

'রিনিতা, যাও, আমি কথা দিচ্ছি, কার্নিভালটা শেষ হয়ে গেলে তোমাকে সাহায্য করব আমি। যত কাজ আছে, জমিয়ে রেখে দাও, দু'জনে মিলে একসঙ্গে করে ফেলব পরে। কালকেই শেষ হয়ে যাবে কার্নিভাল। একটা দিন অপেক্ষা করতে পারবে না?'

'তুমি আমাকে বারবিগুলো সাজাতে সাহায্য করবে?' জিজ্ঞেস করল রিনিতা।

'করব। আরও যদি কোন কাজ থাকে সেটাও করে দেব। এমনকি চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে বললেও নেব।'

উজ্জ্বল হলো রিনিতার মুখ। 'ঠিক আছে।'

'আর কাল রাতে তোমাকে কার্নিভালেও নিয়ে যাব। খুব মজা হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ, হবে।'

'এখন তো তোমার আর খারাপ লাগছে না?'

মাথা নাড়ল রিনিতা, 'না, লাগছে না।'

'তাহলে আর কোন ধরনের দুষ্টুমি করবে না, কিংবা মিথ্যে কথা বলবে না আমার সঙ্গে, বলো?'

'না, বলব না।'

আমাকে গুড-বাই জানিয়ে বেরিয়ে গেল রিনিতা।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। একটা সমস্যার সমাধান করা গেল। আরও একটা জিনিস, যতটা খারাপ ভেবেছি রিনিতাকে, ও আসলে তত খারাপ নয়।

'আমার একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছে না!' মুসা বলল। পরদিন স্কুল ছুটির পর স্কুলের জিমনেশিয়ামে যেতে যেতে কথা বলছি আমি, মুসা আর কিশোর। 'আজ রাতে কার্নিভাল। সারাটা দিন কেটে গেল, অথচ কোন অঘটন ঘটল না।'

'এখন পর্যন্ত ঘটেনি,' আমি বললাম। 'তবে এখনও সময় আছে ঘটার।'

আর্ট রুম থেকে জিনিসপত্রগুলো জিমনেশিয়ামে বয়ে নিচ্ছি আমরা। আর বেশি সময় নেই। সব কিছু গোছগাছ করে সাজিয়ে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি।

কার্নিভাল খতম! কোনমতেই কথাটা মাথা থেকে দূর করতে পারছি না।

সত্যি কি অঘটন ঘটবে? শেষ পর্যন্ত পণ্ড হবে কার্নিভাল?

'আভনে আগুন লাগার খবরটা সবাই জেনে গেছে,' মুসা বলল। 'অনেকেই বাড়ি থেকে কুকিস আর অন্যান্য খাবার বানিয়ে নিয়ে আসবে। গত বছরের চেয়ে বেশি খাবার পাব এবার মনে হচ্ছে।'

'পেলে তো ভালই,' আমি বললাম। 'খাবারের টেবিলগুলো থেকেই বেশি টাকা আসে।'

হাতে করে নিয়ে আসা ছবিগুলো নামিয়ে রেখে জিমনেশিয়ামের দরজা খুললাম।

কেউ আছে ভেতরে। মনে হলো পেছনের দরজার দিকে ছুটে চলে গেল একটা ছায়ামূর্তি।

'কে গেল?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কই,' জবাব দিল কিশোর, 'আমি তো কাউকে দেখলাম না।'

'আমিও না,' মুসা বলল।

ছবিগুলো তুলে নিতে নিতে বললাম, 'কি জানি! ভুলই দেখেছি হয়তো। যাকগে, ওসব ফালতু ভাবনা বাদ দিয়ে এগুলো গুছিয়ে ফেলি বরং।'

হাতের জিনিসগুলো নামিয়ে রেখে সোজা হলো কিশোর। 'আরও কিছু জিনিস গিয়ে নিয়ে আসি।'

'মাসকিং টেপটা নিয়ে এসো মনে করে,' মুসা বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে জিমনেশিয়াম থেকে প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল কিশোর।

খাবারের টেবিলগুলোর কাছে আমাকে নিয়ে গেল মুসা। 'দেখো, কত খাবার চলে এসেছে এখনই। আরও আসবে।'

বড় বড় ডিশের মধ্যে নানা রকম খাবার টিনের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

খিদেটা চাগিয়ে উঠল আমার। একটা বার্গার তুলে নিয়ে খেয়ে ফেললে কেমন হয়? দামটা না হয় দিয়ে দেব মুসাকে। ওর বিক্রয়ের আমিই হব প্রথম ক্রেতা।

একটা টেবিলের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঢাকনা সরিয়ে একটা বার্গার তুলে নিলাম।

কামড় বসালাম।

একটা টুকরো কেটে নিয়ে চিবানো শুরু করলাম।

রবারের মত শক্ত শক্ত লাগল কি যেন। আঁশটে গন্ধ। স্বাদটা মোটেও ভাল না।

বার্গারটা চোখের সামনে এনে ভালমত দেখলাম ভেতরে কি আছে।

পরক্ষণে ওয়াক-থুহ্ করে ফেলে দিতে লাগলাম মুখের খাবার।

গুলিয়ে উঠতে লাগল পেটের মধ্যে।

বমি ঠেকালাম কোনমতে।

এগারো

'কি ব্যাপার?' উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল মুসা।

'দেখো, কি দিয়েছে ভেতরে!'

মুসাও দেখল। 'কাঁচা মাংস!'

'কুচি করে কাটা কাঁচা মাংস। পচে গেছে।'

প্লেটের প্রতিটি বারগার পরীক্ষা করে দেখতে লাগল মুসা। সবগুলোতে একই রকম পচা মাংস। ডালর সঙ্গে মেশানো। তারমানে পচাটা পরে কেউ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

মুখের মধ্যে এতটাই খারাপ লাগতে লাগল, দৌড়ে গিয়ে বেসিনের কল থেকে প্রচুর পানি দিয়ে গড়গড়া করে এলাম। তারপরেও বিশ্রী স্বাদটা কোনমতেই যেতে চাইল না মুখ থেকে। ভয়ানক খারাপ লাগছে।

আমি ফিরে আসতেই মুসা বলে উঠল, 'সবগুলো বার্গারেই আজেবাজে জিনিস আছে। পচা মাংস তো বটেই, কোন কোনটাতে পোকাও আছে। কে করল অকাজটা? নতুন করে বানানোরও সময় নেই। কি করব আমরা এখন?'

'চলো, মিস মুরকে গিয়ে জানাই,' আমি বললাম। 'দেখি, কোন একটা

বুদ্ধি বের করতে পারেন কিনা।'

সব কথা শুনে ঠোঁট কামড়াতে লাগলেন মিস মূর।

'পচা মাংস,' বিড়বিড় করতে লাগলেন তিনি। 'পচা...'

কাঁপতে শুরু করলেন হঠাৎ। কপালে ভাঁজ পড়ছে। চেয়ারে বসে পড়ে দুই হাতে মাথা টিপে ধরলেন।

'মনে হচ্ছে এই কার্নিভাল আমাদের বন্ধই করে দিতে হবে,' বললেন তিনি।

'খাইছে!' তোতলাতে শুরু করল মুসা। 'ব-ব-বলেন কি! এত কষ্ট করলাম!'

'জানি,' ভীত কণ্ঠে বললেন মিস মূর। 'তোমাদের খাটনি তো নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু পরিস্থিতি আমার ভাল ঠেকছে না।'

চট করে পরস্পরের দিকে তাকালাম আমি আর মুসা।

'ঠিকই বলেছেন উনি,' আমি বললাম মুসার দিকে তাকিয়ে। 'অনেকগুলো খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে গত ক'দিনে। এখনও ঘটতেই আছে।'

'কিন্তু মাথামুণ্ড তো কিছু বুঝতে পারছি না,' মুসা বলল। 'এত খাটাখাটনি করলাম, সবই পানিতে যেতে বসেছে দেখছি! এরচেয়ে খারাপ আর কি ঘটবে?'

'অনেক কিছু,' বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলেন মিস মূর।

রীতিমত ভীত দেখাচ্ছে তাঁকে। অবাক লাগল আমার। রহস্যময় মনে হলো। জিজ্ঞেস করলাম, 'তার মানে?'

তিনি জবাব দেয়ার আগেই ছুটে ঘরে ঢুকল টেরি। আমাকে আর মুসাকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজিত স্বরে জানাল, 'আই, ডাংকিং ট্যাংকটা রেডি করে ফেলেছি। দেখবে, এসো। প্রথমেই উঠতে চাইছে তোমাদের কিশোর শার্লকটা। কাজ করে কিনা পরীক্ষা করে দেখতে চাইছে।'

খোঁচা না দিয়ে যেন কথা বলতে পারে না টেরি।

ভ্রূকুটি করলেন মিস মূর। তাঁর আঙুলের আঙটিটার দিকে চোখ পড়ল আমার। জানালা দিয়ে আসা আলোয় যেন আগুনের মত জ্বলছে।

আমাকে ওটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চট করে হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন মিস মূর।

'চলো, ডাংকিং ট্যাংকটা দেখে আসি,' উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

দল বেঁধে জিমনেশিয়ামে ফিরে এলাম আমরা।

'হাই!' হাত নাড়ল কিশোর। ডাংকিং মেশিনের ওপরের একটা বেঞ্চে বসে আছে সে। নিচে একটা বড় ট্যাংক ভর্তি পানি। পাশে দাঁড়ালো লাল-সাদা ছোট গোল টার্গেট।

'এ খেলনাটা আমার সব সময়ই পছন্দ,' ওপর থেকে বলল কিশোর। 'কেউ কখনও পানিতে ফেলতে পারেনি আমাকে। সে-জন্যেই চ্যালেঞ্জ করলাম টেরিকে। পারলে ফেলুক।'

টেরিও রাজি। মেশিন থেকে খানিক দূরে ছোট একটা টুলের ওপর তিনটা ছোট ছোট বল রাখা। একটা বল তুলে নিল সে। পর পর তিনবার ছুঁড়বে। বল যদি টার্গেটে আঘাত হানে, সরে যাবে বেঞ্চটা। নিচের পানিতে পড়ে যাবে কিশোর। লাগাতে না পারলে পড়বে না। খেলাটা এটাই।

'সাবধান, টেরি,' মিস মূর বললেন। 'গায়েটায়ে যেন না লাগে। বিশেষ করে মাথায়। তোমার তো নিশানা একেবারেই ভাল না।'

'ভাববেন না, মিস মূর,' টেরি বলল, 'টার্গেট ছাড়া কোথাও মারব না।' কিশোরকে ডেকে জিজ্ঞেস করল সে, 'রেডি?'

হাই তুলল কিশোর। 'তুমি মারতে থাকো। আমি এই সুযোগে ঘুমিয়ে নিই।'

বলটা শক্ত করে চেপে ধরল টেরি। হাতটা পিছিয়ে এনে ভালমত টার্গেট সই করে ছুঁড়ে মারল।

টার্গেটের অনেক দূর দিয়ে গিয়ে পেছনের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে পানিতে পড়ল বলটা।

হেসে উঠল মুসা। 'আহা, কি সই রে! পুরস্কার দেয়া দরকার।

জ্বলে উঠল টেরির চোখ।

'টেরি, হয়েছে,' মিস মূর বললেন, কিন্তু গলায় জোর নেই তাঁর। কণ্ঠস্বরটাও কেঁপে উঠল বলে মনে হলো। 'কি করে কাজ করে মেশিন, সেটা তো দেখা হলো। আমারও এবার। কিশোর, নেমে এসো।'

'না না, প্লীজ, মিস মূর!' তাড়াতাড়ি আরেকটা বল তুলে নিল টেরি। 'আরও দু'বার মারার সুযোগ আছে আমার। এবার আর মিস করব না।'

হাত ঘুরিয়ে বল ছুঁড়ল টেরি। প্রায় টার্গেট ছুঁয়ে গিয়ে দেয়ালে লাগল

এবার বল।

আবার হেসে উঠল মুসা।

ছোঁ মেরে তৃতীয় বলটা তুলে নিল টেরি।

চিৎকার করে উঠলেন মিস মূর। 'না না, আর মারার দরকার নেই। পানিতে পড়লে কাপড় ভিজবে অহেতুক। ভেজা কাপড়ে কার্নিভালের কাজ করতে পারবে না।'

কিন্তু শুনল না টেরি। জেদ চেপে গেছে তার। পানিতে ফেলবেই কিশোরকে।

বল ছুঁড়ে মারল।

আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে ঠং করে উঠল টার্গেটে লেগে।

চোখের পলকে কিশোরের নিচ থেকে বেঞ্চটা সরে গেল।

ঝপ করে নিচের পানিতে পড়ে গেল সে।

বিকট এক চিৎকার দিয়ে পানিতে দাপাদাপি শুরু করল কিশোর।

'তোলো আমাকে! জলদি তোলো!'

প্রথমে ভাবলাম, দুষ্টুমি করে এ রকম চিৎকার করছে। মুসা এগিয়ে গেল। মুহূর্ত পরে পানিতে ভেসে উঠতে দেখলাম কিশোরের মুখ। টকটকে লাল হয়ে গেছে।

'আরে তোলো না, দেখছ কি! আমি বেরোতে পারছি না!'

পানি থেকে বাষ্প উঠতে দেখলাম এতক্ষণে।

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছি! বের করো জলদি!'

আমরা কাছে যেতে যেতেই চোখ বুজে এল তার। নিথর হয়ে গেল দেহটা। তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে।

বারো

ট্যাংকের কাছে পৌঁছে গেছি সবাই। কিনারে উঠে দাঁড়ালাম।

পানি থেকে বাষ্প উঠছে। ফুটন্ত পানি।

'দেখি, হাতটা বাড়াও তো!' চিৎকার করে বলল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। হাতও বাড়াল না। মুসার কথা শোনেনি।

ভীষণ গরম পানির তোয়াক্কা না করে, পানিতে হাত ডুবিয়ে দিয়ে ধরাধরি করে ওকে তুলে আনলাম আমরা।

'মরে গেল নাকি? শ্বাস নিচ্ছে?' প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছে টেরি। অকাজটা করার সময় করেছে, এখন ঘাবড়ে গেছে। আমার মনে হলো ইচ্ছে করে ট্যাংকে গরম পানি রেখে কিশোরকে ভোগাতে চেয়েছিল সে, কিন্তু এই উত্তাপে যে এত তাড়াতাড়ি একজন মানুষ এমন নেতিয়ে পড়তে পারে কল্পনাই করেনি।

চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে এসে ঢুকল মিস্টার টনিং। সঙ্গে তার সহকারী কুপার।

মেঝেতে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছি কিশোরকে। লাল হয়ে গেছে চামড়া। সিদ্ধ চিংড়ি মাছের মত। তবে দম নিচ্ছে।

'পানি...' জ্ঞান ফিরে আসছে তার। 'পানিটা ভীষণ গরম!'

কপালে হাত বুলিয়ে দিলাম তার। পানির গরমে চামড়া এত গরম হয়ে আছে, মনে হলো একশো দশ ডিগ্রী জ্বর।

'অসম্ভব!' পানি ছুঁয়ে দেখে এসে বলল মিস্টার টনিং। 'আমি নিজের হাতে পানি ভরে রেখে গেছি। একেবারেই ঠাণ্ডা ছিল।'

'নার্সের অফিসে নিয়ে যাও ওকে,' মিস মূর বললেন। 'কুইক!'

কিশোরকে ধরে খাড়া করল মিস্টার টনিং আর কুপার। মুসা সাহায্য করল ওদের। অর্ধেক হাঁটিয়ে, অর্ধেক বয়ে, জিমনেশিয়াম থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে।

'সত্যি বলছি,' আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল টেরি, 'আমি কিছু করিনি। আমি জানতামও না যে পানিটা গরম। কসম!'

কেঁপে উঠল মিস মূরের ঠোঁট। 'সাংঘাতিক কিছু ঘটবে আজ রাতে...জানি আমি!'

'কি করে জানলেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

চুলের মধ্যে হাত চালালেন তিনি, 'জানি!'

'তাহলে কি করব আমরা? কি করতে বলেন?'

মাথা সোজা করলেন মিস মূর। 'এসো আমার সঙ্গে। প্রিন্সিপালকে বলে

anmsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com©

কার্নিভালটা বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।'

'নার্সের ফোন,' রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে প্রিন্সিপাল জানালেন। 'কিশোর ভাল আছে এখন।'

তাঁর অফিসে বসে আছি আমি আর মিস মূর।

দুই হাত ডেস্কে ছড়িয়ে দিয়ে মিস মূরের দিকে তাকালেন প্রিন্সিপাল। 'আপনার কথা বুঝতে পারছি আমি, মিস মূর। আমারও ইচ্ছে কার্নিভালটা বন্ধ করে দিই। কিন্তু সময় নেই আর এখন।'

আংটিটার দিকে তাকালেন মিস মূর। ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাঁকে।

'আরও সাবধান থাকতে হবে আরকি আমাদের,' প্রিন্সিপাল বললেন। 'থানায় ফোন করে দিচ্ছি। পুলিশ পাঠাক। যাতে কড়া নজর রাখতে পারে চতুর্দিকে।'

নীরস স্বরে 'থ্যাংক ইউ' বলে উঠে দাঁড়ালেন মিস মূর। প্রিন্সিপালের ব্যবস্থাটা তাঁর পছন্দ হয়নি।

অফিসের বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস মূর, আপনার শরীর খারাপ নাকি?'

অন্য হাত দিয়ে আংটিটা চেপে ধরলেন মিস মূর।

আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হল ধরে প্রায় দৌড়ানো শুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন মোড় ঘুরে অন্য পাশে।

'উঁহু, রাতে আমি খাব না বাড়িতে,' মা'কে মানা করে দিল রিনিতা। 'রবিনের সঙ্গে কার্নিভালে যাচ্ছি, ওখানেই খাব। না, রবিন?'

পচা মাংস ভরা বার্গারটার কথা মনে করে ঢোক গিললাম। 'উঁম্!...হ্যাঁ, ভাল ভাল খাবার বানানো হয়েছে।'

'তা তো বানাবেই,' রিনিতা বলল। 'সব সময়ই বানায়।'

'বার্গারগুলোই বেশি ভাল হয়,' মা বলল। 'হট ডগও খারাপ বানায় না। বানিয়েছে নাকি রে এবার, রবিন?'

পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল আমার। খোদাই জানে, হট ডগের মধ্যে কি দিয়ে রাখবে। জ্যান্ত পোকা-টোকা...ভাবতে চাইলাম না আর।

'হট ডগ বানিয়েছে,' শুকনো স্বরে জবাব দিলাম। 'কুকিস। আরও কত কি।'

'চলো চলো,' তাগাদা দিল রিনিতা। 'দেরি এখন একদম সহ্য হচ্ছে না আমার। নেব না বলে বোসো না আবার। নিয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে।'

'মনে আছে,' নিতে মানা করলে এখন খুন করবে আমাকে রিনিতা। বার্গারের মধ্যে পচা মাংস দিয়েছে বললেও বিশ্বাস করবে না। ভাববে আমি বাহানা করে ঠেকাতে চাইছি।

'চলো,' বলে কোন দিকে না তাকিয়ে দরজার দিকে রওনা দিলাম।

তেরো

'মিস মূরের ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক না হলেই বাঁচি,' মুসা বলল। 'এখন পর্যন্ত আর কোন অঘটন যখন ঘটেনি, মনে হয় আর ঘটবে না।'

'আর কি ঘটবে!' মন খারাপ করে বললাম। 'কিশোরকে তো বিদেয়ই করে ছাড়ল।' বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওকে। নার্স বলেছে, অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা বিছানায় থাকতে হবে।

মুসার খাবারের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর রিনিতা। দলে দলে লোক আসছে কার্নিভালে। হই-চই, হাসাহাসি চলছে। অকাতরে টাকা খরচ করছে খাবার আর গেমগুলোতে।

'পচা মাংস দেয়া সমস্ত বার্গার ফেলে দিয়েছি,' মুসা জানাল। 'বাড়ি গিয়ে তাড়াহুড়া করে বানিয়েছি এগুলো। মা সাহায্য না করলে পারতাম না। গতবারের চেয়ে খাবার এবার বেশি পেয়েছি। কিন্তু লাভ কি? গতবার তো পচা মাংস ছিল না।'

চকোলেট দেয়া কুকিগুলো ভাল করে দেখলাম। পোকাটোকা চোখে পড়ল না। কিন্তু তারপরেও মুখে তুলতে সাহস করলাম না ওগুলো।

'আমাকে দুটো সুগার কুকি কিনে দাও,' রিনিতা বলল।

'এক ডলার,' দাম জানাল মুসা।

টাকা বের করে দিলাম। দুটো কুকি নিল রিনিতা। একটাতে কামড় বসিয়েই 'আঁউ' করে উঠল। ধড়াস করে উঠল আমার বুকের মধ্যে। কিন্তু

আছে নাকি?

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো?'

'দারুণ! দারুণ টেস্ট!' রিনিতা বলল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আর্ট সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভাল ভিড় ওখানেও। মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের পছন্দের জিনিস কিনে দিচ্ছেন।

টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে বিক্রি করতে ব্যস্ত মেলিসা টাউ। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন?'

'সাংঘাতিক ভাল!' হাসিমুখে জানাল সে। 'বিড বলল, টিকেট বিক্রির পালা এখন তোমার। ওর ডিউটি শেষ হয়েছে।'

'ঠিক আছে,' বলে রিনিতার দিকে তাকালাম। 'রিনিতা, নিজে নিজে ঘোরো এখন। আমাকে গিয়ে এখন দরজায় দাঁড়াতে হবে, টিকেট দিতে।'

'ভয় নেই। আমি ওর ওপর নজর রাখব,' হঠাৎ করে আমাদের পেছনে এসে উদয় হলো টেরি।

দ্বিধা করতে লাগলাম। রিনিতাকে টেরির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না। তবে একা যাওয়ার চেয়ে সঙ্গে কেউ একজন থাকাটা বরং ভাল।

'ভয় পেয়ো না,' আমাকে আশ্বস্ত করতে চাইল টেরি, 'ওকে আর ডাংকিং ট্যাংকে ফেলব না।'

মনে হলো, কিশোরের ক্ষতিটা পুষিয়ে দেয়ার জন্যেই যেচে এসে সাহায্য করতে চাইছে টেরি। স্বর নরম করে কথা বলছে।

'আমি টেরির সঙ্গেই যাচ্ছি,' রিনিতা বলল। দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে না ওর।

'ঠিক আছে যাও,' আমি বললাম। 'কোন অসুবিধে হলে সামনের দরজার কাছে চলে যেয়ো, আমি ওখানেই থাকব।'

'আচ্ছা,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল রিনিতা। তর সইছে না ওর।

ভারী দম নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমিও। জিমনেশিয়ামের দরজার দিকে। টিকেট টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিড।

'এলে তাহলে,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'ঘাম ছুটে গেছে আমার। তোমার না আরও আধা ঘণ্টা আগে আসার কথা ছিল?'

'সরি, বিড, দেরি হয়ে গেল,' ক্যাশ বাক্সের সামনে বসে পড়লাম। 'আমার কাজটা যে করে দিলে, সে-জন্যে অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ। আমার দিকে তাকাতেই মাথা ঝাঁকালাম। কার্নিভালের জন্যে পুলিশের সাহায্য চেয়েছিলেন প্রিন্সিপাল। বাড়তি সতর্কতা।

একের পর এক লোক আসছে। তাদের কাছে টিকিট বিক্রি করছি। মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে রিনিতা কোথায় আছে দেখার চেষ্টা করছি।

বাস্কেটবল-ছোঁড়া খেলাটার কাছে রিনিতাকে দেখতে পেলাম।

কিন্তু টেরি কোথায়?

নিজে এসেই রিনিতাকে সাহায্য করতে চাইল। এখন নিজেই গায়েব। ওর ওপর ভরসা করাটাই ভুল হয়েছে।

আবার যখন ফিরে তাকালাম, দেখি বুদ-এ রিঙ ছুঁড়ে বিশাল একটা খেলনা ভালুক জিতে নিয়েছে রিনিতা। ফেস-পেইনটিং টেবিলের দিকে চলেছে এখন।

মহা আনন্দে আছে সে। আমার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। হয়তো টেরির বকবকানি কিংবা মাতব্বরি সইতে না পেরে নিজেই বিদেয় করে দিয়েছে।

কনসার্ট শো দেখানোর জন্যে স্টেজে গিয়ে উঠল স্কুলের বাদক দল। সবাই ছাত্র-ছাত্রী। বাইরের কাউকে নেয়া হয়নি।

রিনিতা কি করছে দেখার জন্যে আবার মুখ ফেরালাম। মুখে রঙ করাচ্ছে সে।

এখনও টেরির দেখা নেই। কোথায় গেল ও? অস্বস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছি। আবার কোনও শয়তানির তালে নেই তো?

হঠাৎ কমে গেল জিমনেশিয়ামের আলো। দম আটকে ফেললাম। কি ব্যাপার? শুরু হয়ে গেল নাকি!

মুখ ফিরিয়ে দেখি জিমনেশিয়ামে ঢুকছে লম্বা একটা মূর্তি।

গায়ে গোড়ালি ঢাকা ধূসর আলখেল্লা। বড় একটা হুডের আড়ালে মুখ ঢাকা।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে মুখটা দেখার চেষ্টা করলাম। হাত বাড়িয়ে টিকেটের টাকা চাইলাম, 'এক ডলার, প্লীজ!'

আমার কথা যেন কানেই ঢুকল না রহস্যময় মূর্তিটার।

একটা টিকেট বাড়িয়ে ধরে জোরে জোরে বললাম, 'এক ডলার, প্লীজ!'

দুই হাত উঁচু করল মূর্তিটা। মিটমিট শুরু করল জিমনেশিয়ামের আলো। আবার দম আটকে ফেললাম।

চেঁচামেচি শুরু করল লোকে। বাজনা বন্ধ করে দিল বাদক দল।

আচমকা ঠাণ্ডা হয়ে গেল বাতাস। কেঁপে উঠলাম।

আমাকে ঠেলে সরিয়ে ঢুকে পড়ল মূর্তিটা। এগিয়ে যেতে শুরু করল।

'এই যে, থামুন! থামুন!' চিৎকার করে উঠলাম।

আমাকে পাত্তাই দিল না সে। তার দিকে তাকিয়ে আছে লোকে। ভয় পাচ্ছে অনেকে।

'দাঁড়ান!' আবার চিৎকার করে উঠলাম আমি।

জুতোর ডগায় ভর দিয়ে ঘুরতে শুরু করল লোকটা। লাটিমের মত। গতি বাড়ছে ক্রমেই। সেই সঙ্গে আলোর মিটমিটানিও বেড়ে গেল।

কি ঘটছে? কে ও?

মনে হলো আমিও ঘুরতে শুরু করেছি। দ্রুত। আরও দ্রুত।

মাথা চেপে ধরলাম। মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে কেমন যেন।

মনে হলো পুরো জিমনেশিয়ামটাই ঘুরছে। ওই মূর্তিটার মত।

কি করছে ও? ভয় পেয়ে গেছি আমিও।

'থামান!' চিৎকার বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। 'ওকে থামান!'

চোদ্দ

ঘোরের মধ্যে যেন তাকিয়ে আছি মূর্তিটার দিকে। মিটমিট করেই চলেছে আলো। জিমনেশিয়ামের প্রতিটি মানুষ যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। সবার চোখ মূর্তিটার দিকে।

'ওকে ধরুন!' দুর্বল কণ্ঠে চিৎকার করার চেষ্টা করলাম।

থেমে গিয়ে দুই হাত সামনে বাড়িয়ে বাতাসে খোঁচা মারল মূর্তিটা।

আরও দ্রুত জ্বলতে-নিভতে শুরু করল বাতি। দড়াম করে প্রচণ্ড শব্দে বন্ধ

হয়ে গেল জিমনেশিয়ামের দরজা।

অদ্ভুত এক গুঞ্জন উঠল বাতাসে। বাড়তে বাড়তে গর্জনে পরিণত হলো। মনে হচ্ছে যেন বিপদে পড়া বিমান তীব্র গতিতে ধেয়ে চলেছে মাটিতে আছড়ে পড়ার জন্যে।

কিসের শব্দ?

চারপাশে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কাঁপতে শুরু করেছে জিমনেশিয়ামের মেঝে। ভূমিকম্প ভেবে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে কেউ কেউ। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে আমার।

ডাংকিং ট্যাংকের পানি স্রোতের মত গড়ানো শুরু করেছে। ভিজিয়ে দিচ্ছে মেঝে। তুমুল চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে লোকে। ছোটাছুটি করছে লুকিয়ে পড়ার জন্যে।

পায়ে পানি লাগতেই লাফ দিয়ে সরে গেলাম একপাশে। সামনে একটা খাবার টেবিল। তার আড়ালে দেখতে পেলাম রিনিতাকে। লুকানোর চেষ্টা করছে।

টেবিলে উঠে পড়ার কথা ভাবলাম।

ছুটে গেলাম পানি মাড়িয়ে। লাফ দিতে যাব, ঠিক এই সময় দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। মুহূর্তে টেবিলটায় দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেল। কোথা থেকে আগুন এল, কি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে পারলাম না।

কাণ্ড দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচানো শুরু করল রিনিতা। ছুটে সরে গেল টেবিলটার কাছ থেকে। টেবিলটা জ্বলে উঠতে দেখে আরও অস্থির হয়ে গেল লোকে। চতুর্দিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল। কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

বাস্কেটবল বুথটার দিকে ছুটলাম। কিন্তু ওটাতে ওঠারও সময় পেলাম না। বিস্ফোরিত হয়ে গেল।

চিৎকার-চেঁচামেচি বেড়ে গেল কয়েক গুণ। বাতাস ভরে গেল ধোঁয়ায়।

রিনিতাকে খুঁজে বের করা দরকার। ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম।

ঝড়ের কবলে পড়া ডিঙ্গির মত দুলতে আরম্ভ করেছে যেন ঘরটা। সোজা হয়ে হাঁটাই মুশকিল।

'রিনিতা!' চিৎকার করে উঠলাম আবার। 'কোথায় তুমি?'

গুঞ্জনের মত শব্দটা জোরাল হয়ে উঠল আবার। আমার মাথা সই করে ডাইভ দিয়ে নেমে আসতে লাগল যেন।

ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেললাম।

বোলতা! ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা উড়ছে জিমনেশিয়ামের ভেতর। বাতাসে গুঞ্জন তুলে এদিক ওদিক ছুটছে, ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়ছে লোকের ওপর।

বোলতার আক্রমণে পাগলের মত চিৎকার করছে লোকে।

কালো মেঘের মত আমাকে ছেঁকে ধরল এক ঝাঁক বোলতা।

নিজের অজান্তেই বিকট চিৎকার বেরিয়ে গেল যেন আমার গলা চিরে। দুই হাতে মাথা ঢেকে দৌড় দিলাম বাঁচার জন্যে।

এ সময় দেখতে পেলাম মুসাকে। তাকেও বোলতায় আক্রমণ করেছে। বাঁচার জন্যে মেঝে থেকে দুই হাতে পানি তুলে তুলে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওগুলোর দিকে।

আমিও তা-ই করতে লাগলাম। আমাকে ছেড়ে নতুন শিকারকে আক্রমণ করতে সরে গেল বোলতাগুলো।

'বাঁচাও! বাঁচাও! এখান থেকে বের করে নিয়ে যাও আমাকে!' ককিয়ে উঠল একটা ছেলে। মরিয়া হয়ে দৌড় দিল দরজার দিকে। বাড়ি খেল গিয়ে দড়াম করে।

দরজাটা বন্ধ। টানাটানি করেও খুলতে পারল না সে। তালা লাগানো।

দরজার কাছে গিয়ে জড় হচ্ছে লোকে। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু করল খোলার জন্যে।

'বের করো! আমাদের বেরোতে দাও!' চিৎকার করছে কেউ কেউ। 'দোহাই লাগে!'

জবাবে দপ করে জ্বলে উঠল আরেকটা গেম বুদ।

রিনিতাকে খুঁজছে আমার চোখ। পেছনের দেয়ালের কাছে জড়সড় হয়ে থাকতে দেখলাম ওকে। বোলতারা ঘিরে ফেলছে। দুই হাতে মাথা ঢেকে আতঙ্কে চিৎকার শুরু করল।

'রিনিতা!' চেঁচিয়ে ডাকলাম। 'ভয় পেয়ো না। দাঁড়াও, আমি আসছি।'

বোলতার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নিচু করে দৌড় দিলাম। সামনে এসে পড়ছে আতঙ্কিত লোকজন। কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে সরিয়ে দিচ্ছি তাদের। রিনিতার কাছে পৌঁছতে হবে আমাকে।

সামনে দেখতে পেলাম আবার সেই হুড পরা রহস্যময় মূর্তিটাকে। মেঝের ওপর দিয়ে যেন ভেসে চলেছে। কোন কিছুই আটকাতে পারছে না ওকে—বোলতা, মেঝের দুলুনি, ঘরের কাঁপুনি, কিংবা চারপাশে ধরে যাওয়া আগুন; কিছুই ওর কিছু করতে পারছে না।

এগিয়েই চলেছে সে। সোজা ছুটে যাচ্ছে রিনিতার দিকে।

ওর আগেই রিনিতার কাছে পৌঁছে যেতে হবে আমাকে। সামনে পড়ল মুখে রঙ করার ফেস-পেইন্টিং টেবিলটা।

ঘুরে যাওয়ার জায়গা না দেখে উঠে পড়লাম ওটার ওপর। লাফ দিয়ে নামলাম অন্য পাশে। আগুন ধরে গেল ওটাতে। আমি এক মুহূর্ত দেরি করলে আমার গায়েও ধরত।

আগুন থেকে বাঁচার জন্যে লাফ দিয়ে সরে গেলাম।

সামান্য সময় নষ্ট হলো তাতে।

এই সুযোগে রিনিতার কাছে পৌঁছে গেল হুড পরা মূর্তিটা। মাটি থেকে তুলে নিয়ে উঁচু করে ধরল তাকে।

'ছাড়ো ওকে! ছেড়ে দাও!' চিৎকার করে উঠলাম।

আতঙ্কে চেঁচাতে শুরু করল রিনিতা।

তাকে নিয়ে চলতে শুরু করল মূর্তিটা।

পনেরো

হট্টগোলের মাঝে রিনিতার চিৎকার প্রায় শোনাই যাচ্ছে না।

'রবিন! কোথায় তুমি? বাঁচাও আমাকে! বাঁচাও!'

দৌড় দিলাম জিমনেশিয়ামের পেছন দিকে। ওদিকেই রিনিতাকে নিয়ে যাচ্ছে রহস্যময় মূর্তিটা। ঝাঁপিয়ে পড়তে গেলাম ওর ওপর।

মিস করলাম।

মেঝেতে পড়ে এক গড়ান দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আবার। মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিটা। কাঁধে তুলে নিয়েছে রিনিতাকে।

ঝাঁপ তো দিয়েছিলাম ঠিকই। এত দ্রুত সরে গেল কি করে? গায়ে জোরও অনেক। রিনিতাকে যে ভাবে তুলে নিয়েছে, সেটাই তার প্রমাণ।

হট্টগোল এক বিন্দু কমেনি। লোকের ছোটাছুটি, চিৎকার-চেঁচামেচি চলছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে অতি সহজে রিনিতাকে নিয়ে এগিয়ে চলল মূর্তিটা। জিমনেশিয়াম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে।

'রবিন! রবিন! থামাও ওকে!' সমানে চিৎকার করছে রিনিতা। কিল মারতে শুরু করল মূর্তিটার পিঠে।

পরোয়াই করল না মূর্তিটা। লাগছেই না যেন।

আবার তেড়ে গেলাম ওর দিকে।

এতক্ষণে দরজা খুলল জিমনেশিয়ামের। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল পুলিশের লোকটা। তাকে ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে বন্যার তোড়ের মত দরজা দিয়ে বেরোতে শুরু করল জনতা।

'এদিকে আসুন! জলদি!' হাত নেড়ে, চিৎকার করে ডাক দিলাম পুলিশম্যানকে। আমাদের দু'জনের মাঝখানে রয়েছে এখন মূর্তিটা। দরজার দিকে মুখ।

'থামান ওকে!' চিৎকার করে উঠলাম আবার। 'আমার বোনকে নিয়ে যাচ্ছে!'

এগিয়ে আসতে শুরু করল পুলিশম্যান। পাশ কেটে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মূর্তিটা। পারল না। ধরে ফেলল তাকে পুলিশম্যান। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না।

সহজেই তার হাত ছাড়িয়ে নিল মূর্তিটা। চোখের পলকে চলে গেল পুলিশম্যানের পেছনে। রিনিতা তার কাঁধেই রয়েছে।

ঠেকাতে না পারলে বেরিয়ে যাবে! আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম আমি। দৌড় দিলাম ওদের দিকে। কিন্তু সামনে এত বেশি মানুষ বাধা হয়ে আছে, এগোনো মুশকিল।

ঠিক এই সময় মুসাকে দেখতে পেলাম। ছুটে আসছে সে। ওকে দেখে সাহস পেলাম। চিৎকার করে উঠলাম, 'মুসা, থামাও ওকে! রিনিতাকে নিয়ে যাচ্ছে!'

মূর্তিটার কাছাকাছি রয়েছে মুসা। আমার চেয়ে কাছে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দৌড় দিল মূর্তিটার দিকে। ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে তার ওপর। ঝাঁকি

লেগে কাঁধ থেকে পড়ে গেল রিনিতা।

মূর্তিটা এমন করেই পুলিশম্যানের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল সে। আমার চিৎকারে সে-ও যেন সংবিৎ ফিরে পেল। এগিয়ে গেল মুসাকে সাহায্য করতে।

এবার আর বাঁচতে পারল না মূর্তিটা। দু'জনে মিলে আটকে ফেলল তাকে।

মূর্তিটাকে মাটিতে চেপে ধরল পুলিশম্যান।

রিনিতা এসে হাত জড়িয়ে ধরল আমার।

'রবিন! রবিন!' বলে ফোঁপাতে শুরু করল সে। 'এত ভয় আমি জীবনেও পাইনি!'

শক্ত করে ওর হাত ধরে রাখলাম।

মূর্তিটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল পুলিশম্যান। টান দিয়ে হুড সরাল মাথার ওপর থেকে।

মুখের দিকে তাকিয়ে হাবা হয়ে গেলাম। এ-কি!

ষোলো

মিস মুর!

সোনালি চুল চকচক করছে তাঁর। আঙুলের সাদা পাথর বসানো আংটিটা চকচকাচ্ছে।

'আমি না! আমি না!' চিৎকার করে উঠলেন মিস মুর। 'বিশ্বাস করুন, আমি কিচ্ছু করিনি!'

কি বলছেন উনি? হাঁ হয়ে গেছি আমি।

আবার চকচক করে উঠল আংটিটা।

মিস মুরকে নিয়ে যেতে শুরু করল পুলিশ। হাত-পা ছুঁড়ে, চিৎকার করে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

রিনিতার হাত ধরে রাখলাম। থরথর করে কাঁপছে ও।

অকারণে টেরিকে সন্দেহ করে এসেছি। অথচ সব কিছুর মূলে ছিলেন মিস মুর। গত ক'দিনে কার্নিভালকে ঘিরে যতগুলো অঘটন ঘটেছে, সব মিস মুরের কাজ।

কিন্তু কেন? কি ভাবে এতগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটালেন তিনি?

যা ঘটেছে, মানুষের পক্ষে সে-সব ঘটানো সম্ভব নয়। মাটি কাঁপানো, আলো মিটমিট করানো, বোলতার ঝাঁকের আক্রমণ...

কি হয়েছে তাঁর? যতই ভাবছি, অবাক হচ্ছি আরও। এত ভাল একজন মানুষ। এত খারাপ হয়ে গেলেন কি করে? একেবারে নরকের ইবলিস!

জবাব জানা দরকার। এ মুহূর্তে কিশোর থাকলে ভাল হতো। কিন্তু সে-ও তো অকেজো হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। মিস মুরের শয়তানির শিকার হয়ে।

জবাবটা এখন আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। নইলে বাকি জীবনে কোনদিন অস্বস্তি যাবে না আমার।

মিস মুরকে বের করে নিয়ে গেল পুলিশ। রিনিতার হাত ছেড়ে দিয়ে আমি ওদের পেছনে ছুটলাম। গাড়ির পেছনে তুলে ফেলা হয়েছে ততক্ষণে মিস মুরকে। হাতকড়া হুকে লাগিয়ে তালা আটকে দেয়া হয়েছে। যাতে পালাতে না পারেন।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

দেরি করে ফেলেছি।

আমার চিৎকার শুনতে পায়নি ওরা। চলতে শুরু করল গাড়িটা।

পেছন পেছন ছুটলাম। গতি বাড়িয়ে চলে গেল গাড়ি। দাঁড়িয়ে গেলাম।

সামনে মাটিতে কি যেন চকচক করছে। নিচু হয়ে তুলে নিলাম।

সেই সাদা পাথরওয়ালা আংটিটা!

হাত থেকে খুলে পড়ে গেছে? নাকি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন মিস মুর?

পাথরটার দিকে তাকিয়ে আছি। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ভয়ঙ্কর মুখটা।

না তাকিয়ে থাকতে পারছি না। চোখ সরানোর চেষ্টা করেও সরাতে পারছি না। নিজের অজান্তেই আঙুলে ঢোকালাম। স্বাভাবিক ব্যাপার। আংটি হাতে পেলে অবচেতন ভাবে যা করে থাকে লোকে।

ঢলঢলে আংটিটা সহজেই ঢুকে গেল আমার আঙুলে।

খুলে ফেলতে গেলাম।

আর তখনই ঘটল আজব ঘটনাটা। চোখের পলকে টাইট হয়ে গেছে আংটিটা। আটকে গেছে আঙুলের গাঁটে।

টানাটানি শুরু করলাম খোলার জন্যে।

কাজ হচ্ছে না!

শক্ত করে টিপে ধরে জোরে হ্যাঁচকা টান মারলাম।

খুলল না। আটকে গেছে ভালমতই।

চোখের সামনে তুলে ধরলাম আংটিটা। খুলছে না কেন বোঝার চেষ্টা করলাম।

শীতল থাবা দিয়ে আমার হৃৎপিণ্ডটা চেপে ধরল যেন কেউ।

আশ্চর্য! হাসছে এখন মুখটা!

কেন?

সতেরো

'সাবান দিলেই খুলে যাবে,' আংটিটা খুলতে পারছি না শুনে মা বলল।

বাথরুমে গিয়ে সাবান ঘষে আঙুল পিচ্ছিল করে বহুত টানাটানি করলাম। কিন্তু খুলল না আংটিটা।

মা'কে বললাম আবার।

নিজেও চেষ্টা করে দেখল মা। কিছুই করতে পারল না। টানাটানিতে লাল হয়ে গেছে আমার আঙুল। ছড়ে গেছে। ফুলে উঠেছে।

মা বলল, 'তোর আঙুলের তুলনায় ছোট। কেন পরতে গিয়েছিলি?'

কি জবাব দেব?

মা আবার বলল, 'এখন টানাটানি করে হবে না। আটকে গেছে। যে ভাবে আছে রেখে দে, ফোলা কমলে তখন বের করে ফেলা যাবে।'

মা চলে গেল কাজে।

কিন্তু আমি যে ভাবে আছে রেখে দিতে পারলাম না। খোলার চেষ্টা করতেই থাকলাম।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে মুখটা।

হাসতে ওকে দেব না! জেদ বেড়ে গেল আমার। খুলে আমি ফেলবই।

মনে পড়ল, মিস মূরও প্রথমে খুলতে পারেননি। পরে ঠিকই খুলেছেন। তারমানে খোলার কায়দাটা তিনি জেনে গেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

'রবিন! রবিন! দেখে যা,' লিভিং রুম থেকে ডাক দিল মা। 'টেলিভিশনের নিউজে তোদের কার্নিভালটা দেখাচ্ছে।'

লিভিং রুমে দৌড়ে গেলাম। রিনিতাও টেলিভিশনের দিকে তাকিয়ে আছে।

জিমনেশিয়ামের ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন রিপোর্টার। ছেলেমেয়েদের বাবা-মা আর টিচারদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

সবাইকেই ভীত মনে হচ্ছে। বোকা হয়ে গেছে যেন সব। ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন, 'এ রকম একটা ঘটনার জন্যে সবার কাছে ক্ষমা চাইছি আমি। কিন্তু কোনমতেই বুঝতে পারছি না কি করে ঘটল! মনে হচ্ছে আমাদের একজন টিচারের মানসিক সমস্যা হয়েছে। দেখে বোঝা যায় না, স্বাভাবিক মানুষই মনে হয়েছে এতদিন...'

ক্যামেরার সামনে ফুটে উঠল আবার রিপোর্টারের মুখ। 'রকি বীচ মিডল স্কুল বাকি হপ্তার জন্যে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। টিচার মিস এলিজা মূরকে রকি বীচ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্যে।'

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। কি ঘটেছিল তাঁর, জানতে হবে। জানা দরকার, কেন তিনি অতগুলো ভয়াবহ অঘটন ঘটিয়েছেন।

'রাত হয়ে গেছে,' টিভিটা অফ করে দিতে দিতে মা বলল। 'শুতে যা তোরা।'

রান্নাঘরে চলে গেল মা। এঁটো বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে ফেলার জন্যে।

আমি গেলাম ডরোথিকে দেখতে। দানা খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম ওকে। খেল না। তারমানে অবস্থার উন্নতি হয়নি তার। বরং অবনতি দেখা যাচ্ছে। খারাপ হয়ে গেল মনটা।

নিজের ঘরে ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে সোজা বিছানায় গিয়ে উঠলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম গত ক'দিনের ঘটনাগুলোর কথা।

নাহ্, কাল যেতেই হবে মিস মূরের সঙ্গে দেখা করতে। জানতেই হবে কেন তিনি এ সব করেছেন। আর শেষ পর্যন্ত কিভাবেই বা খুলেছেন আংটিটা।

*

সারাদিন পরিশ্রম করেছি। অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। কিন্তু তারপরেও ঘুম আসতে চাইল না। শেষে যা-ও বা এল, গাঢ় হলো না। অস্থির নিদ্রা। ঘুমের মধ্যে ছটফট করতে থাকলাম। তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন।

'এত অন্ধকার!' বিড়বিড় করে বললাম। 'এত অন্ধকার লাগছে কেন?'

সামনে এগোনোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধাক্কা খেলাম দেয়ালে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

দেয়াল হাতড়াতে শুরু করলাম। পিচ্ছিল। মাখনের মত লাগছে।

গোলক ধাঁধায় ঢুকে পড়েছি, বুঝতে পারলাম। বেরোতে হবে আমাকে। বেরোনোর পথ খুঁজতে হবে।

কোথায় যাচ্ছি? গোলক ধাঁধার শেষ মাথায় কি আছে?

টলতে টলতে এগিয়ে চলেছি অন্ধের মত। পুরু হয়ে হাতে লেগে যাচ্ছে চটচটে কি যেন!

চমকে গেলাম। রক্ত না তো?

অবশেষে কেটে গেল অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছি এখন। জিমনেশিয়ামের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমি। চারপাশে প্রচুর হাঁস। তবে হাঁসগুলো হাঁস নয় পুরোপুরি। দেহটা হাঁসের, মাথাটা মানুষের।

একটা হাঁসকে কিশোর পাশার মত লাগল। পাশেরটা মুসার মত। অন্য আরেকটাকে টেরির মত।

'উঁহু! এ ঠিক না! মানুষ কখনও হাঁসের মত হতে পারে না!' চিৎকার করে উঠতে চাইলাম। স্বর বেরোল না।

প্রচণ্ড রাগ হলো। টেরির মাথাওয়ালা হাঁসটাকে খপ করে চেপে ধরে গলা মুচড়ে দিলাম। টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম মুণ্ডটা। পিচকারির মত রক্ত বেরিয়ে এল ছেঁড়া গলা থেকে। চারপাশে পালক উড়তে শুরু করল।

হা-হা করে অট্টহাসি হাসতে শুরু করলাম। অদ্ভুত হাঁসের রক্তে চুবিয়ে নিলাম সাদা পাথরটা।

আঙুলে ঘষে রক্ত লাগাতে লাগাতে বললাম, 'খুব পিচ্ছিল। এবার আর আংটি খুলতে অসুবিধে হবে না।'

টানাটানি করে আঙুলে ব্যথা পেলাম।

লাফ দিয়ে উঠে বসলাম বিছানায়।

জানালায় আলোর আভাস। ভোর হচ্ছে।

কি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন! মুখে হাত বোলাতে গিয়ে হাতটা সরিয়ে আনলাম। জ্বোরো রোগীর মত গরম। ঘামে ভিজে পিঠের সঙ্গে লেগে গেছে গায়ের শার্টটা।

এত ঘামছি কেন? ভেবে অবাক লাগল। এত দুঃস্বপ্ন দেখারই বা কি কারণ?

আংটিটার দিকে তাকালাম। আমার দিকে তাকিয়ে আছে ধোঁয়াটে মুখটা।

কেঁপে উঠলাম।

আমার চোখে চোখে তাকিয়ে আছে ওটা। যেন আমাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে।

'রবিন!'

ভীষণ চমকে গেলাম। কে ডাকল? দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি রিনিতা দাঁড়িয়ে আছে।

'কি?' চিৎকার করে উঠলাম। 'তোমার এ ঘরে কি?'

'রবিন, এ কাণ্ড করেছ কেন?'

'কি কাণ্ড? কি করেছি?'

জানালায় আলো বাড়ছে। ঘরের চারপাশে তাকালাম।

সর্বনাশ!

এ কি করেছি?

সারা ঘরে পালক। মেঝেতে পালক। বিছানায় পালক। চেয়ার, টেবিল, কোনখানে বাকি নেই।

কোথা থেকে এসেছে বুঝতে অসুবিধে হলো না। আমার বালিশগুলো চিরে ফালা ফালা করে ফেলা হয়েছে। যেন কোন উন্মত্ত বুনো জানোয়ারের কাজ।

আঠারো

'রবিন, তোর সমস্যাটা কি?' মা জিজ্ঞেস করল। 'মনে হচ্ছে একটা দানব এসে দাপাদাপি করে গেছে এখানে।'

আমি আমার ঘরটা পরিষ্কার শুরু করেছি, এ সময় মা এসে ঢুকেছে।

'কিছু না, পালক,' এমন ভঙ্গিতে বললাম, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি।

চিন্তিত ভঙ্গিতে বালিশের ছেঁড়া কাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইল মা। 'তোর তো এ রকম বদ স্বভাব ছিল না কোনদিন। কখনও এ রকম কাণ্ড করিসনি।'

সেটা কি আর আমি জানি না। কেন যে করেছি এই কাণ্ড নিজেও বুঝতে পারছি না।

'ঘুমের মধ্যে করেছি,' কণ্ঠস্বর শান্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। 'দুঃস্বপ্নের ঘোরে।'

মা'র উদ্বেগ বাড়ল। দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পালক পরিষ্কারে মন দিলাম।

'রবিন, কাল রাতে কার্নিভালে কিছু হয়নি তো তোর? মাথায় বাড়িটাড়ি লাগা বা অন্য কিছু…হলে…'

বাকিটা যে কি বলল মা, শুনতে পেলাম না। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ বাড়িয়ে দিয়ে ঢেকে দিলাম তার কণ্ঠস্বর।

সারাটা দিন আর বাড়ি থেকে বেরোলাম না সেদিন। মন তো ভাল লাগলই না, শরীরও না। প্রায় সারাটা দিনই নিজের ঘরে দরজা দিয়ে থাকলাম। মাঝে দু'একবার গিয়ে ডরোথিকে দেখে এসেছি। অবস্থা ভাল না পাখিটার। ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। খাঁচার মধ্যে নেতিয়ে পড়ে আছে। নানা খাওয়ানোর চেষ্টা করেছি। খায়নি।

আরেকটা ব্যাপার শঙ্কিত করে তুলেছে আমাকে। থেকে থেকেই নানা রকম কুবুদ্ধি এসেছে মাথায়। সবই ধ্বংসাত্মক চিন্তা-ভাবনা। আরও আছে।

মেজাজ ঠিক রাখতে না পারা। রিনিতা এসেছিল তার পুতুলগুলোর কথা বলতে। ঘ্যানঘ্যান করার সুযোগই দিইনি। কষে এক লাথি মেরে দিয়েছি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছে সে। হতবাক। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে গেছে ঘর থেকে। বেশ মজা পেয়েছি আমি। অথচ কোনদিন কারও সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করিনি। রিনিতার সঙ্গে করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

বিকেল বেলা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

হাসপাতালে এসে দোতলায় উঠলাম। যেখানে মিস মূরকে রাখা হয়েছে।

'এখানেই আছে,' নার্স জানাল। 'ফুলটুল এনেছ নাকি?'

'না,' জবাব দিলাম। 'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'সরি, দেখা করা নিষেধ। ডাক্তারের অর্ডার।'

'আমি তাঁর ছাত্র,' তর্ক শুরু করলাম। 'দেখা আমাকে করতেই হবে। এক মিনিটের জন্যে হলেও।'

'সম্ভব না,' ভ্রূকুটি করল নার্স। 'কার্ডটার্ড বা কিছু দিতে চাইলে রেখে যেতে পারো। পৌঁছে দেব।' টেলিফোনের জবাব দিতে ঘুরল সে।

লম্বা হলওয়েটার শেষ মাথা পর্যন্ত তাকালাম। দু'দিকের দেয়ালে দুই সারি দরজা।

রুম নম্বরটা জানতে পারলে হতো। নার্সের চোখ এড়িয়ে টুক করে ঢুকে পড়তে পারতাম।

গলা বাড়িয়ে নার্সের ডেস্কে রাখা চার্টটা পড়ার চেষ্টা করলাম। মিস মূরের রুম নম্বর লেখা থাকতে পারে।

কোন নম্বর চোখে পড়ল না।

রিসিভার রেখে ঘুরে দাঁড়াল নার্স। 'এখানে ঘোরাঘুরি কোরো না তো। যাও এখন।'

'মিস মূরকে একটা কার্ড দিতে চাই,' বললাম ওকে। 'আসছি। এক মিনিট।'

দৌড়ে নিচে নেমে এসে একটা গিফট শপ থেকে একটা কার্ড কিনলাম। তাতে লেখা: 'শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠুন'। ফিরে এলাম ওপরতলায়। নার্সের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।

'রেখে যাও। আমি পৌঁছে দেব,' মুখ তুলল না নার্স। একটা ফর্ম পূরণে ব্যস্ত।

'প্লীজ, এখনই দিন। আমি দেখে যেতে চাই। খুব জরুরী।'

'কি নাছোড়বান্দা ছেলে রে বাবা!' মুখ তুলে তাকাল নার্স। একটানে আমার হাত থেকে কার্ডটা প্রায় কেড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাগত ভঙ্গিতে গটমট করে এগিয়ে চলল হলওয়ে ধরে। তাকিয়ে রইলাম আমি। কোন্ রুমে ঢোকে দেখার জন্যে।

বাঁ পাশের শেষ দরজাটার সামনে গিয়ে থামল সে। হলের শেষ মাথায় একটা বেরোনোর দরজাও চোখে পড়ল আমার।

আমি নিশ্চিত ওই দরজার ওপাশে সিঁড়ি আছে।

দ্রুত নেমে এলাম আবার নিচতলায়। হল ধরে এমন ভঙ্গিতে এগোলাম, যেন হাসপাতালেরই লোক আমি। কোথায় যেতে হবে জানা আছে আমার।

কেউ বাধা দিল না আমাকে।

হলের শেষ মাথায় এখানেও একটা বেরোনোর দরজা আছে। দোতলারটার মত। কোন দিকে না তাকিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম ওপরে।

দোতলার দরজাটা সাবধানে ফাঁক করলাম। নার্স ফিরে যাচ্ছে তার ডেস্কে।

এটাই সুযোগ।

দরজা খুলে ঢুকে পড়ল হলওয়েতে। এক দৌড়ে এসে দাঁড়ালাম বাঁ দিকের শেষ দরজাটার কাছে।

বিছানায় চুপচাপ পড়ে আছেন মিস মূর। মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে। জানালার পর্দা সব টেনে দেয়া।

আস্তে করে দরজাটা লাগিয়ে দিলাম পেছনে। ফিরে তাকালেন মিস মূর।

'রবিন,' দুর্বল কণ্ঠে বললেন তিনি। এইমাত্র যে কার্ডটা পাঠিয়েছি, সেটা নেড়ে বললেন, 'থ্যাংক ইউ।'

ধীরে ধীরে এগোলাম তাঁর বিছানার দিকে। সাংঘাতিক খারাপ দেখাচ্ছে মিস মূরকে। ধসে গেছেন। তাঁর উজ্জ্বল নীল চোখ দুটো এখন নিষ্প্রভ। ধূসর হয়ে গেছে রঙ। মরে গেছে যেন।

'মিস মূর,' জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে, 'কি হয়েছিল আপনার?'

আমার দিকে তাকালেন তিনি। চোখের দৃষ্টি শূন্য।

'গত রাতে···জিমনেশিয়ামে···' সূত্র ধরিয়ে দিতে চাইলাম তাঁকে। 'কেন

করেছিলেন ও রকম?'

চোখ বুজলেন তিনি। 'জানি না, রবিন। বোঝাতে পারব না তোমাকে।'

'কিন্তু…আপনিই কি করেছেন ওসব?' জিজ্ঞেস করলাম। 'চকবোর্ডে লিখে রাখা। আর্ট রুমের ছবি নষ্ট করা। আরও যত দুর্ঘটনা, সব?'

চোখের পাতা মিটমিট করে খুললেন আবার তিনি। 'করেছি…মানে করানো হয়েছে…' অনিশ্চিত মনে হলো তাঁর কথা। 'তবে করেছি এ কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না।'

আঙুলের আঙটিটা ঘোরাতে শুরু করলাম। আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার। ঘোরে। কিন্তু খোলে না। 'জিমনেশিয়ামের বাইরে আপনার একটা জিনিস পেয়েছি। দিতে এলাম।'

বাঁ হাতটা তুলে দেখালাম। ঝিক্ করে উঠল পাথরটা।

এমনই চমকে গেলেন মিস মূর, বিকৃত হয়ে গেল তাঁর চেহারা। 'রবিন! এটা তোমার হাতে কেন?'

'বললাম না, পেয়েছি…'

খপ্ করে আমার হাত চেপে ধরে আংটিটা খোলার জন্যে টানাটানি শুরু করলেন তিনি। 'খোলো! খোলো! জলদি খোলো!' টানাটানির চোটে হাত ব্যথা হয়ে গেল আমার।

'পারছি না তো!' ককিয়ে উঠলাম। 'কি করে খুলতে হয় সেটা জানার জন্যেই তো এলাম আপনার কাছে।'

যত ভাবে সম্ভব চেষ্টা করে দেখলেন তিনি। না পেরে হাল ছেড়ে দিলেন। হাত দুটো অসহায় ভঙ্গিতে নেতিয়ে পড়ল তাঁর দুই পাশে।

'সরাও ওটা!' খসখসে কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি। 'আমার সামনে থেকে সরাও! আর যত তাড়াতাড়ি পারো, গিয়ে খুলে ফেলে দাও। যদি ভাল চাও তো!'

ভয় পেয়ে গেলাম। 'মিস মূর, প্লীজ…'

'যাও এখন, চলে যাও এখান থেকে!' মিস মূর বললেন। 'তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারব না আমি। বাঁচতে যদি চাও, শীঘ্রি গিয়ে আংটিটা খুলে ফেলোগে!'

পা টেনে টেনে বিমূঢ়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। যে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছি সেটা দিয়েই নেমে এলাম আবার নিচে। বেরিয়ে এলাম বসন্তের

ঝলমলে সূর্যালোকে।

লাফ দিয়ে সাইকেলে উঠে বসলাম। জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরে চললাম। বার বার কানে বাজতে থাকল মিস মূরের কণ্ঠ: আংটিটা খুলে ফেলোগে…খুলে ফেলোগে…খুলে ফেলোগে…

বাড়ি ফিরে সাইকেলটা গ্যারেজের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দৌড়ে এসে ঢুকলাম ঘরে। হ্যাঁ, খুলতে হবে! খুলে ফেলতেই হবে! নিজেকে বোঝালাম।

রান্নাঘরে ঢুকে থামলাম। আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল পাথরটা।

তুলে ধরলাম চোখের সামনে।

মুখটা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভয়ানক চোখ দুটোর দৃষ্টি যেন ড্রিল মেশিনের মত ছিদ্র করে ঢুকে যাচ্ছে আমার চোখের ভেতর দিয়ে।

কিছুতেই চোখ সরাতে পারছি না মুখটা থেকে। চোখের ভারী দৃষ্টি যেন সম্মোহিত করে ফেলছে আমাকে।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল মন। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে যেন ছেয়ে গেল দেহ। নাহ্, ঠিকই তো আছে সব। নিজেকে বোঝালাম। কোথাও কোন গণ্ডগোল নেই। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। অকারণ উদ্বেগে ভুগছি আমি।

ঢিল হয়ে এল স্নায়ু।

খুব ভাল লাগছে এখন। পরম শান্তি।

আহ্, কি দারুণ একটা আংটি!

উনিশ

সে-রাতে আর দুঃস্বপ্ন দেখলাম না।

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে ডরোথিকে দেখতে গেলাম। বেচারি। খাঁচার মেঝেতে নেতিয়ে পড়ে আছে। দুর্বল ভঙ্গিতে দম নিচ্ছে। ভাল ডানাটাও আর নড়াতে পারছে না এখন।

'ওঠ, ডরোথি, দানা খা।' ওর ঠোঁট ফাঁক করে দানা ঢুকিয়ে দিলাম। গিলল না। কিংবা গিলতে পারল না।

ঘরে ঢুকল কে যেন। ডাক শোনা গেল, 'রবিন! কোথায় তুমি?'

বারান্দার দরজা দিয়ে মুখ বের করে বললাম, 'কিশোর, এসো।'

সঙ্গে মুসাও আছে।

'কি করছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পাখিটাকে দানা খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। খাচ্ছে না। বাঁচবে না মনে হয়।'

'আন্টি বলল, তোমারও নাকি শরীর খারাপ?'

'ঠিক খারাপ না। তবে কেমন যেন লাগছে। জিমনেশিয়ামে দুর্ঘটনাটার পর থেকে।'

কানের কাছে কে যেন সতর্ক করে দিয়ে গেল ফিসফিস করে: খবরদার, আংটির কথা বলবে না! খুব খারাপ হবে তাহলে!

কে কথা বলল? চারপাশে তাকালাম। কাউকে দেখতে পেলাম না।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, কিছু না,' মাথা নাড়লাম। তারমানে কথাটা শুনতে পায়নি সে বা মুসা। কেবল আমিই শুনেছি।

সত্যি শুনেছি তো! না মিস মূরের মত পাগল হয়ে যাচ্ছি আমিও?

কিশোর আর মুসার সঙ্গে কথা বলে দুর্ভাবনাটা দূর করে দিতে চাইলাম মাথা থেকে। তবে আংটিটা ওদের দেখালাম না। সারাক্ষণ প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখলাম।

আমাকে বাইরে নিয়ে যেতে এসেছে ওরা।

কিন্তু বেরোতে ইচ্ছে করল না আমার। আমার শরীর সত্যি খারাপ বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ কথাটথা বলে চলে গেল দু জনে।

বাগানে বেরিয়ে এলাম। ঘোরাঘুরি করলাম খানিকক্ষণ। কিছুই ভাল লাগছে না। সারাক্ষণ একটার পর একটা কুবুদ্ধি আসছে মনে। খারাপ কিছু করতে ইচ্ছে করছে। মনে হচ্ছে তাহলে ভাল লাগবে।

গ্যারেজে ঢুকে একটা ইঁদুর ধরে লেজ কেটে ছেড়ে দিলাম। যন্ত্রণায় কাহিল হয়ে যখন ছোটাছুটি করতে লাগল রক্তাক্ত ইঁদুরটা, ভীষণ মজা পেলাম। বেরিয়ে এসে পড়শীদের কুকুরটাকে ঢিল ছুঁড়ে বিরক্ত করলাম খানিক। তারপর মা'র অতি শখের গোলাপ বাগানের ফুল ছিঁড়ে, ডাল ভেঙে, চারা মাড়িয়ে সর্বনাশ করলাম।

লাঞ্চের সময় হলো। পোকা ধরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলাম দেশলাইয়ের বাক্সে। খেতে বসে রিনিতার অলক্ষে ফেলে দিলাম তার প্লেটে। পোকা দেখে যখন ভয়ানক চিৎকার শুরু করে দিল সে, দারুণ মজা পেলাম।

বুঝতে পারছি, কিছু একটা হয়ে গেছে আমার মগজের। আংটিটার প্রভাব পড়েছে নিশ্চয় কোনভাবে আমার ওপর। একটা অদ্ভুত ভাবনা মাথায় এল। মনে হলো, সাংঘাতিক ক্ষমতাবলে আমাকে দিয়ে এ সব শয়তানি করিয়ে নিচ্ছে আংটির ভেতরের মুখটা। মিস মূরকে দিয়েও করিয়েছিল। সে আভাস তো তিনি দিয়েছেনই।

লাঞ্চের পর নিজের ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। আংটিটা তুলে নিয়ে এলাম চোখের সামনে। গতরাতের পর থেকে যে প্রশান্তিটা এসেছিল দেহে, ক্রমশ কেটে যাচ্ছে সেটা। যেন সম্মোহনের রেশ কেটে যাচ্ছে। আবার বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম আংটিটার ওপর।

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ভেতরের মুখটা।

যত শয়তানিগুলো আমাকে দিয়ে ওটাই করাচ্ছে, আরও নিশ্চিত হলাম।

কেঁপে উঠলাম বুঝতে পেরে।

'যা করছি এখন, এটা তো সবে শুরু,' মগজের কোথায় যেন রিনরিন করে উঠল কথাগুলো।

মিস মূরের কথা ভাবলাম। কি ভালই না ছিলেন মহিলা। তিনি এ রকম খারাপ কাজ করবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি কেউ।

প্রথমে ছোটখাট খারাপ কাজ করলেন। তারপর কার্নিভালের রাতে পুরো বদলে গেলেন। কি করবেন, বুঝতে পেরেছিলেন তিনি সেটা। সে-জন্যেই প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে বন্ধ করাতে চেয়েছিলেন কার্নিভাল। শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। অলৌকিক ক্ষমতা এসে ভর করল তাঁর ওপর। মানুষ খুনের নেশা চাপল। শেষ করে দিতে চাইলেন জিমনেশিয়াম ভর্তি এতগুলো মানুষকে।

পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল আমার। অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম।

কি করব?

মুক্তি পাব কি করে?

হঠাৎ আংটিটা চেপে ধরে হ্যাঁচকা টান মারলাম। টেনে খুলে ফেলতে চাইলাম আবার। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'খোল, শয়তান, খোল! তোকে আমি রাখব

না আমার আঙুলে!'

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল মুখটা।

আমার ভাবনাগুলো যেন সে পড়তে পারছে। তার ভাবনাগুলো আমি।

'থামো!' কানের কাছে আদেশ শোনা গেল। কাউকে দেখলাম না। 'আংটিটা তুমি খুলতে পারবে না!'

থেমে গেলাম।

'যা করছ, এটা তো মাত্র শুরু।' আবার শুনতে পেলাম। 'আরও কত কিছু আসবে। মজার মজার জিনিস। আসল কাজটা তো এখনও বাকি। খুন করতে হবে তোমাকে। রিনিতাকে খুন। তোমার মা'কে। তোমার বন্ধুদেরকে। দেখবে তখন কত মজা।'

বিশ

সহ্য করতে পারলাম না আর।

লাফ দিয়ে উঠে বসলাম বিছানায়।

ঘরে থাকলে পাগল হয়ে যাব। ছুটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। গ্যারেজ থেকে সাইকেলটা বের করে চেপে বসলাম। রাস্তায় বেরিয়ে চালানো শুরু করলাম পাহাড়ের দিকে।

কিন্তু স্বস্তি পেলাম না কোন ভাবেই।

উন্মাদের মত সাইকেল ছুটিয়ে চললাম দিগ্বিদিক। যে করেই হোক, চরম সর্বনাশ ঘটে যাবার আগেই খুলে ফেলে দিতে হবে আংটিটা।

কিন্তু কি ভাবে? কি ভাবে?

বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত উপায়টা খেলে গেল মগজে। সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে দিলাম। ফিরে চললাম বাড়িতে।

বাগানে ঢুকে ঘাসের ওপর ঠেলে ফেলে দিলাম সাইকেলটা। গ্যারেজে গিয়ে সময় নষ্ট করলাম না। দৌড়ে ঢুকলাম বাড়িতে। সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম মাটির নিচের ঘরে। ব্যক্তিগত একটা ওঅর্কশপ আছে আমার ওখানে।

আমি কাজ করি। মাঝেসাঝে বাবাও এসে কাজ করে এখানে।

চেঁচিয়ে বললাম, 'শুনতে পাচ্ছিস আংটি! আজ তোকে আমি খুলে ফেলবই!'

খলখল হাসি শোনা গেল। কানের কাছে ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল অদৃশ্য কেউ।

ওঅর্কবেঞ্চটার দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম।

বেঞ্চের পাশের একটা টুলের ওপর রাখা ডরোথির খাঁচাটা।

খাঁচার গায়ে টোকা দিয়ে ডাকলাম, 'ডরোথি! ডরোথি!' বলে।

সাড়া দিল না পাখিটা। চোখ মেলল না। নড়ল না।

মরে গেছে।

মা এখানে এনে লুকিয়ে রেখে গেছে, যাতে বাড়ি ফিরে আমার চোখে না পড়ে ওটা। রয়ে সয়ে দুঃসংবাদটা জানাত আমাকে।

বেচারি ডরোথি। এমনিতেই মন খারাপ, পাখিটাকে মরে যেতে দেখে আরও খারাপ হয়ে গেল। বাঁচানোর এত চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না।

আংটিটার কথা মনে পড়ল আবার। ডরোথিকে নিয়ে শোক করার সময় নেই।

টুল বক্সের ডালা খুললাম। প্রয়োজনীয় যন্ত্রটার জন্যে হাতড়াতে শুরু করলাম। প্লায়ার্স...স্ক্রুড্রাইভার...হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি, মেটাল কাটার। ধাতব জিনিস কাটার যন্ত্র।

এটাই দরকার। শয়তান আংটিটাকে খসানোর জন্যে।

যন্ত্রটা তুলে নিয়ে আংটির ওপর ধরলাম।

'কেটে বিদেয় করব এখন তোকে!' গর্জে উঠলাম আংটির মুখটার দিকে তাকিয়ে।

কাটারের এক মাথা আংটি স্পর্শ করল।

জ্বলতে আরম্ভ করল আংটিটা। আলোর সুইচ টিপলে যেমন করে জ্বলে ওঠে, তেমনি ভাবে।

গরম ছ্যাঁকা লাগছে আঙুলে।

'যতই চেষ্টা করো,' ধমকে উঠলাম, 'আমি তোমাকে রাখব না!'

মেটাল কাটারের ফলা দিয়ে চেপে ধরলাম আংটিটাকে। ক্রমেই উজ্জ্বলতা বাড়ছে পাথরের। সাদা রঙ কালো হয়ে যাচ্ছে।

http://www.murchona.com© ...@yahoo.com

ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ঘন, কালো ধোঁয়া। ভলকে ভলকে। দম আটকে দিতে লাগল।

এমন কাশা শুরু করলাম, কাশতে কাশতে আমার হাত থেকে পড়ে গেল মেটাল কাটার।

ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। দম নিতে পারছি না।

আংটিটাকে তুলে আনলাম চোখের কাছে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'থামো! থামো!'

মুখ ফাঁক হতেই গলায় ঢুকে গেল ঝাঁজাল ধোঁয়া। চোখে লেগে চোখ জ্বালা করছে।

দেখতে পাচ্ছি না তো! দম নিতে পারছি না!

প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠেছে আংটি। আঙুল পোড়াচ্ছে।

লাফ দিয়ে পাথরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মুখটা।

ধোঁয়াটে, ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করতে থাকা একটা ভূতুড়ে অবয়ব। ধোঁয়ার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর চেহারাটা। আংটিতে থাকতে খুদে ছিল। বাইরে বেরিয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। নাক, চোখ, মুখ সবই আছে। তবে বড়ই কুৎসিত।

আমার মুখের সামনে চলে এল। বড় হতে শুরু করল হাঁ-টা।

বড়! বড়! আরও বড়!

গিলে খাবে নাকি আমাকে?

কুঁকড়ে গেলাম। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা।

শরীর বাঁকা করে মাথা নামিয়ে পিছিয়ে যেতে চাইলাম। উরু ঠেকে গেল ওঅর্কবেঞ্চে।

কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। মরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে যেন চোখে। তাকাতে কষ্ট হচ্ছে। তবু তাকিয়ে আছি ধোঁয়ার মধ্যে ভাসমান ভয়ঙ্কর মুখটার দিকে।

'এতটাই শয়তান হয়ে গেছি, আংটির মধ্যে থাকা আর সম্ভব না,' খসখসে কণ্ঠে বলে উঠল প্রেতাত্মাটা। 'বাঁচতে হলে জ্যান্ত একটা দেহে ঢুকতে হবে এখন আমাকে। তোমার দেহে ঢুকব।'

'না না!' চিৎকার করে উঠলাম। 'দোহাই তোমার···'

'পালাতে পারবে না!' আমার কথা কানেও তুলল না দানবটা। 'কেউ পারে

না আংটি যতক্ষণ পরে থাকে!'

ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সিঁড়িটার দিকে তাকালাম।

দৌড় দিলে পৌঁছাতে পারব?

আমার মনের কথা পড়ে ফেলল যেন ভূতটা, 'দৌড়ানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। তোমাকে আসর করবই আমি, তোমার টিচারকে যেমন করেছিলাম।'

'মিস মূর!' বলে উঠলাম। হাঁ করে দম নিচ্ছি। মনে পড়ল কি রকম অদ্ভুত লাগছিল তাঁকে কার্নিভালে। কি ক্ষমতাশালী! আর কি রকম শয়তান!

'পুলিশ যখন তাকে ধরে ফেলল, আংটিটা ঢিল করে দিলাম, যাতে খুলে ফেলতে পারে,' ভূতটা বলল। 'ধরা পড়ে গেছে ও, ওকে আর তেমন ব্যবহার করতে পারতাম না আমি। তারচেয়ে নতুন কারও ওপর সওয়ার হওয়াই ভাল। তুমি আমার নতুন শিকার। এখন আমি তোমাকে তৈরি করে নিয়েছি। এ যাবৎ যে শয়তানিগুলো করেছ তুমি, সেগুলো ছিল আমার করানো ছোটখাট পরীক্ষা। তোমার দেহে ঢুকে লাভ হবে কিনা দেখতে চাইছিলাম। তোমার কাছে খারাপ মনে হতে পারে কাজগুলো। কিন্তু আমার কাছে ভাল।'

কর্কশ স্বরে ভয়ঙ্কর খলখলে হাসি হেসে উঠল আবার সে।

কেঁপে উঠলাম। আতঙ্কে।

'এখন তুমি রেডি, রবিন,' বলল সে। 'আংটি ত্যাগ করেছি। এখন তোমার ভেতরে ঢুকব। তোমার ভেতরে বাস করব। দু'জনে মিলে বড় বড় শয়তানি করে বেড়াব।'

'না!' চিৎকার করে উঠলাম। 'আমি তোমাকে বাধা দেব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাধা দেব।'

'পারবে না। তুমি আংটি পরে আছো। এখন আমি তোমাকে পরব।'

'না!···না!···'

'কি করব বলো? আমাকেও তো বাঁচতে হবে!' বন্ধ ঘরে গমগম করে উঠল ভূতটার কণ্ঠ।

কালো ধোঁয়া উড়ে এল আমার দিকে। ঠাণ্ডা। ভীষণ ঠাণ্ডা।

এগিয়ে আসছে মুখটা। কাছে। আরও কাছে।

আংটিটা! ভাবলাম, যে কোন ভাবেই হোক খুলে ফেলতেই হবে।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে পাগলের মত তাকাতে লাগলাম। আলো চমকাচ্ছে

ধাতব কোন কিছুতে। ওঅর্কবেঞ্চে পড়ে আছে ওটা।

করাত!

এটাতেই হবে। আর কোন উপায় নেই আমার।

আংটি খোলার একটাই রাস্তা।

আঙুলটা কেটে ফেলে দিতে হবে।

হাত বাড়ালাম করাতটার জন্যে। কালো ধোঁয়া ঘিরে ফেলছে আমাকে। ঠাণ্ডা। বরফের মত ঠাণ্ডা।

চেপে ধরলাম করাতের ধাতব হাতল। ভারী দম নিলাম।

তুলে আনলাম হাতের কাছে। চেপে ধরলাম আংটি পরা আঙুলে। চামড়ায় কেটে বসল ধারাল দাঁতগুলো।

একুশ

ঢোক গিললাম।

দম আটকে ফেলেছি।

হাত কাঁপছে আমার।

কালো ধোঁয়া ঘুরছে আমাকে ঘিরে। যতটা সম্ভব শ্বাস টানা বন্ধ রাখলাম। ভাবলাম তাতে হয়তো ভূতটার আমার ভেতরে ঢুকতে অসুবিধে হবে।

আমার দিকে তেড়ে আসছে মুখটা।

ঠাণ্ডা···অতিরিক্ত ঠাণ্ডা···

বরফের মত জমে যেতে লাগল যেন আমার শরীরটা।

কাটো! তাগাদা দিলাম নিজেকে। কেটে ফেলো আঙুল! তোমার দেহে ভূত ভর করার আগেই!

মরা পাখিটার ওপর চোখ পড়ল। কাত হয়ে পড়ে আছে।

নতুন একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠল মগজে।

উপায় বোধহয় আরেকটা পাওয়া গেল!

পাখিটা···

হাত থেকে ছেড়ে দিলাম করাত। মেঝেতে পড়ে ঝনন্ করে উঠল।

চেপে ধরে টান দিলাম আংটিটা। প্রেতাত্মাটা বেরিয়ে যাওয়াতে হালকা লাগছে এখন।

খোল্! মিনতি করে বললাম। দোহাই তোর, খুলে আয়!

সুড়ুৎ!

আমাকে চমকে দিয়ে আঙুল থেকে খুলে এল আংটিটা।

বিশ্বাস হলো না। তাই ভাল করে দেখলাম।

হ্যাঁ! সত্যি খুলেছে!

চোখের পলকে পাখিটাকে বের করে এনে আংটিটা ঠেসে ঢুকিয়ে দিলাম তার পায়ে।

মাথার ওপরে ভয়ানক বিকৃত হয়ে গেল ভূতুড়ে মুখটা। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল, 'না! না! না!'

শাঁ করে ছাতের দিকে উঠে গেল। ঠাণ্ডা যেন গলে বেরিয়ে যেতে শুরু করল আমার দেহ থেকে। হাতের তালু ডলতে শুরু করলাম। গরম হয়ে উঠছি দ্রুত।

বাতাসে ঝুলে আছে ধোঁয়ার টুকরোটা। পাক খাচ্ছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। পাখিটার কাছ থেকে নিজেকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

পারল না শেষ পর্যন্ত। আরেকবার বিকট চিৎকার দিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করল পাখিটার দিকে।

ভয়াবহ মুখটা সহ ধোঁয়ার টুকরোটাকে টান দিয়ে শুষে নিল যেন মরা পাখিটা।

ধোঁয়া গেছে। পরিষ্কার বাতাসে দম নিলাম আমি। ডরোথির দিকে তাকালাম।

কাজ হবে তো? অবাক হয়ে ভাবলাম। মুক্তি পাব পিশাচের কবল থেকে?

সামান্য কেঁপে উঠল ডরোথির দেহ। সর্বনাশ! শয়তান ঢুকে জাগিয়ে দিচ্ছে নাকি মরা পাখিকে?

কিন্তু ওই একবারই কাঁপল ডরোথির দেহটা। তারপর গলায় দম আটকে যাওয়ার মত একটা শব্দ করে নিথর হয়ে গেল।

খোঁচা দিয়ে দেখলাম। মরে গেছে।

সারা গা থরথর করে কাঁপছে আমার।

সত্যি মেরে ফেলেছি দুষ্ট প্রেতাত্মাটাকে? বিশ্বাস করতে পারছি না।

নিশ্চিত হওয়ার একটাই উপায়।

খুব সাবধানে পাখির পা থেকে খুলে নিলাম আংটিটা। হাত কাঁপছে। আবার কোনও নতুন চাল চালবে না তো পিশাচটা?

আলোয় তুলে পাথরটার ভেতরে তাকালাম।

'মরেছে! মরেছে!' চিৎকার করে উঠলাম।

পরিষ্কার পাথর। ধোঁয়াটে কোন মুখ নেই আর ওর ভেতরে।

স্বাভাবিক হীরার মত ঝিক্ করে উঠল আলো লেগে।

আস্তে করে তুলে আনলাম মরা পাখিটাকে।

অন্যের দেহে ভর করে বাঁচতে চেয়েছিল শয়তানটা, আমি দিয়েছি ওকে মৃত্যু।

হাসতে শুরু করলাম। বেড়েই চলল হাসি।

মুক্তির আনন্দে নাচা শুরু করলাম।

থামলাম এক সময়। হাঁপ ধরে গেছে।

শেষ করে দিয়েছি দুষ্ট প্রেতকে।

পাখিটার সঙ্গে আংটিটাকেও মাটিতে পুঁতে ফেলব ঠিক করলাম। তাহলে আর কখনও ওই আংটি নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

ছোট একটা বাক্স খুঁজে বের করলাম। তাতে রাখলাম ডরোথির শক্ত হয়ে যাওয়া দেহটা। আংটিটা রাখলাম তার পাশে। পেরেক ঠুকে বন্ধ করে দিলাম বাক্সের ডালা।

বাক্সটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম মাটির নিচের ঘর থেকে। বাগানের এমন জায়গায় কবর দিলাম ডরোথির বডিটা, যেখানে কেউ কখনও যায় না। কবরের ওপর একটা ক্রুশ বসিয়ে দিলাম।

যাক, এবার নিশ্চিন্ত।

হাত ঝাড়তে ঝাড়তে তাকালাম কবরটার দিকে। শোকাহত কণ্ঠে শেষ বিদায় জানালাম ডরোথিকে, 'গুড-বাই, ডরোথি। তোকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। কিন্তু মরে গিয়ে তুই আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলি।'

***

গোয়েন্দা রোবট

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

সোমবারের রোদ ঝলমলে এক সকাল। ক্লাসরুমের পিছন দিকে বসে আছে কিশোর, মুসা আর রবিন।

'ইস, টিফিন হচ্ছে না কেন?' ফিসফিস করে বলল মুসা।

বিস্ময় ফুটল কিশোরের চেহারায়।

'এইমাত্র না ক্লাসে ঢুকলাম,' বলল ও।

'তাতে কী? খিদে পেয়েছে তো।'

হেসে ফেলল কিশোর।

'তোমার খিদে পায় না কখন?' বলল ফিসফিসিয়ে। 'মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি যেন খাওয়ার জন্যেই বেঁচে আছ!'

মুসা অবাক হওয়ার ভান করল।

'জীবনে এ ছাড়া আর আছেটা কী?'

মিসেস মোরেল, অর্থাৎ ওদের টিচার এ সময় কথা বলে উঠলেন।

'ফোর্থ গ্রেডাররা সবাই শোনো,' বললেন। 'তোমাদের জন্যে দুটো জরুরী খবর আছে।'

সবাই সাগ্রহে মুখ তুলে চাইল।

'ভাল খবর যেন হয়, ভাল খাবারের মতন,' গলা খাদে নামিয়ে বলল মুসা। 'এক্সট্রা ম্যাথ টেস্ট না হলেই বাঁচি।'

'প্রথম খবর হচ্ছে, আজকে নতুন এক ছাত্র ভর্তি হচ্ছে আমাদের ক্লাসে,' বললেন মিসেস মোরেল। 'ওর নাম স্টিভ ম্যাকগ্রা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে। আশা করি নতুন বন্ধুকে তোমরা আপন করে নেবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, কি বলো, ডেভিড?' রুডি মার্শ ওর প্রাণের দোসর ডেভিড বুনের দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসল।

রুডি মার্শ সহপাঠীদের পিছনে লাগতে ওস্তাদ। তাদেরকে নানাভাবে

জ্বালাতন করে মজা পায় সে। বয়সে অনেক বড় বলে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।

রুডির চোখের নোংরা দৃষ্টি ভাল লাগল না রবিনের। নতুন ছেলেটা ভীরু হলেই সেরেছে, মনে মনে বলল ও। তা হলে পেয়ে বসবে একেবারে রুডি। ওর হাড় কালি করে ছাড়বে।

'স্টিভ ওর মার সাথে অফিসে আছে,' বললেন টিচার। 'ফর্ম ফিলাপ করছে। এখুনি এসে পড়বে।' একটু বিরতি নিলেন তিনি। 'এবার আসি দু'নম্বর জরুরী খবরটায়। আমরা বিজ্ঞান মেলা করতে চলেছি।'

'ইয়া!' গোটা ক্লাস এবার সত্যি সত্যি আগ্রহী হয়ে উঠল।

জুলি মরগ্যান সামনের সারি থেকে হাত তুলল।

'পুরো স্কুল অংশ নেবে?' প্রশ্ন করল। 'উঁচু ক্লাসের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমরা পারব কেন?'

মাথা নাড়লেন মিসেস মোরেল।

'এবার অংশ নেবে শুধু থার্ড আর ফোর্থ গ্রেডাররা। তোমরা দু'সপ্তা সময় পাচ্ছ প্রজেক্ট তৈরির জন্য। অডিটোরিয়ামে ডিসপ্লে করা হবে। প্রজেক্টগুলো বেশ ক'দিন থাকবে ডিসপ্লেতে, যাতে তোমাদের গার্জেনরাও দেখতে পারেন।'

'পুরস্কার থাকবে?' ডেভিড বুন জিজ্ঞেস করল।

মুচকি হাসলেন মিসেস মোরেল।

'একটা। প্রথম পুরস্কারের জন্য গিফট সার্টিফিকেট দিচ্ছে ইকো প্লেস নামে এক দোকান।'

'ভালই তো!' রুডি ডেভিডের উদ্দেশে গলা নামিয়ে বলল।

'ইকো প্লেস বড় দোকান,' বলল ডেভিড। 'কিপটেমি করবে না। ফার্স্ট প্রাইযটা জিততে পারলে হয়।'

ওদিকে, মুসা মহা চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

'ভাবছি নতুন কোন খাবার আবিষ্কার করব কিনা,' বলল। 'খেতে ভাল, পেটও ভরবে অথচ ক্যালরি নেই।'

'এরকম জিনিস তো এখনই আছে,' নিচু গলায় বলল রবিন। 'তার নাম পানি।'

এ সময় দরজা খুলে গেল। একটি ছেলে প্রবেশ করল ক্লাসে। কিশোরের মনে হলো ছেলেটি ফিফথ কিংবা সিক্সথ গ্রেডের ছাত্র। ক্লাসের আর সবার

চাইতে বড় ও। এক মাথা চুল আর মুখ ভর্তি দাগ ওর। এ মুহূর্তে ছেলেটির মুখের চেহারা লাল টকটকে হয়ে আছে।

'হ্যাঁ? বলো?' মিসেস মোরেল প্রশ্ন করলেন।

'আ-আমি ন-নতুন এসেছি,' তো-তো করে বলল ছেলেটি।

'তুমিই স্টিভ ম্যাকগ্রা?' টিচারের কণ্ঠে বিস্ময়।

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটি।

হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবার মিসেস মোরেল।

'এসো, স্টিভ,' বলে সারা ক্লাসে চোখ বুলিয়ে সীট খুঁজতে লাগলেন। 'ওই যে,' বললেন অবশেষে, 'পিছন দিকে, রবিনের পাশে একটা খালি ডেস্ক দেখতে পাচ্ছি।'

রবিন হাত নেড়ে খালি সীটটা আঙুল-ইশারায় দেখাল।

স্টিভ দুই সারি আসনের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেল। জুলি মরগ্যানের ডেস্কের পাশ কাটাবার সময় ওর গায়ের ধাক্কায় উড়ে গেল এক গাদা কাগজ।

'ওহ, সরি,' কাঁচুমাচু মুখে বলল স্টিভ। ঘুরে দাঁড়াতেই, ধপাস! ওর ব্যাগের গুঁতোয় মেঝেতে ছিটকে পড়েছে ডেস্কে রাখা বইগুলো।

'আমি সত্যিই–' বলতে শুরু করে ঝুঁকে পড়ল ও। ঠকাস করে এক পেন্সিল বক্স পড়ে গেল মেঝের উপর। পেন্সিল আর কলম গড়িয়ে গেল যার যেদিকে খুশি। ফোর্থ গ্রেডাররা সব হেসে ফেলল।

'তুমি বসে পড়ো, স্টিভ,' সহানুভূতিপূর্ণ কোমল গলায় বললেন টিচার। 'অত নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই।' যদিও তিনি জানেন, প্রথমদিন সবাই নার্ভাস বোধ করে।

বাকি পথটুকু নির্বিঘ্নে পার হলো স্টিভ। কিন্তু বসতে গিয়ে আবার বিপত্তি। চেয়ারটা উল্টে ফেলে দিল।

রুডি মার্শ স্টিভের উল্টোদিকে বসা।

'অ্যাই, স্টিভ,' বলে উঠল ও, 'তুমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছ আমরা জানলাম কীভাবে বলো তো?' পরমুহূর্তে নিজেই জবাবটা দিয়ে দিল। 'কারণ তুমি হচ্ছ একটা চলন্ত ভূমিকম্প!'

গোটা ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। লাল মুখ আরও লাল হয়ে গেল স্টিভের।

http://www.murchona.com

বেচারা খুবই অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছে, উপলব্ধি করল গোয়েন্দাপ্রধান।

'এভাবে কথা বলা ঠিক না, রুডি,' পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য বলে উঠলেন মিসেস মোরেল। 'তুমি নতুন স্কুলে ভর্তি হলে প্রথমদিন কেমন লাগবে ভেবে দেখো।'

'আমি অন্তত ক্লাসে কিংকঙের মত তোলপাড় করব না,' রুডি বিড়বিড় করে বলল ডেভিডের উদ্দেশে। 'ওকে দেখতে ঠিক কিংকঙের মত না?'

খলখল করে হেসে উঠল ডেভিড।

দু'তিনবার ফেল করা রুডি প্রথম প্রথম ওকে কীভাবে জ্বালাতন করত মনে আছে কিশোরের। ও ঠিক করল, স্টিভের জড়তা কাটাতে সাহায্য করবে।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুলের উঠনে স্টিভের জন্য অপেক্ষা করছিল কিশোর।

'হাই, আমি কিশোর,' বলল। 'রুডির কথায় কিছু মনে কোরো না। ও সবার পেছনে লাগে। ক্লাসের অন্যরা সবাই ভাল। এসো, আমার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।'

মুসাকেও এমনকী স্টিভের পাশে পিচ্চি দেখাচ্ছে। রবিন তো আরও ছোট।

'হাই,' বলল মুসা। চিপস এগিয়ে দিল।

'থ্যাংকস, আমি নিয়ে এসেছি,' বলল স্টিভ। জ্যাকেটের পকেট থেকে একই রকম এক প্যাকেট চিপস বের করল।

মুখ উজ্জ্বল হলো মুসার।

'আরে, তোমারও নাচো চীয ফ্লেভার পছন্দ!'

'যেখানেই যাই সঙ্গে স্ন্যাক থাকে,' বলল স্টিভ। 'বিশেষ করে নাচো চীয চিপস।'

'খাইছে!' সোৎসাহে বলে উঠল মুসা। 'আমিও একবার বড় বড় পকেটওয়ালা জ্যাকেট কিনতে চেয়েছিলাম, যাতে সঙ্গে সব সময় স্ন্যাক রাখতে পারি।'

'বুদ্ধিটা তো চমৎকার,' সপ্রশংস কণ্ঠে বলল স্টিভ। 'ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতে আমরা ওকল্যান্ড রেইডার্স ফুটবল ক্লাবের ভীষণ ভক্ত ছিলাম। আমার

বড় ভাই এই ওকল্যান্ড রেইডার্স জ্যাকেটটা কিনে দিয়েছে। মাকে বলতে হবে ভেতরে আরও পকেট বানিয়ে দিতে।'

হেসে উঠল ওরা।

'অ্যাই, কিশোর, মনে হচ্ছে আমাদের সাথে ওর বনবে।' স্টিভের কাঁধ চাপড়ে দিল রবিন।

'কিক বল খেলতে এসো,' স্টিভের উদ্দেশে বলল কিশোর। ফোর্থ গ্রেডারদের একটা দলের দিকে পা বাড়াল।

গ্রাহাম গুচের সঙ্গে এ সময় দেখা হয়ে গেল ওদের। ও থার্ড গ্রেডার।

'তোমরা বিজ্ঞান মেলার কথা শুনেছ?' ছেলেটি জিজ্ঞেস করল তিন গোয়েন্দাকে।

'সকালে শুনলাম,' জানাল কিশোর। 'আমার মাথায় এর মধ্যেই চমৎকার এক প্ল্যান এসে গেছে।'

'আমারও,' বলল রবিন।

'প্রথম পুরস্কার দিচ্ছে ইকো প্রেস-গিফট সার্টিফিকেট,' বলল গুচ। 'দারুণ না? দুর্দান্ত সব জিনিস আছে ওদের দোকানে।'

'তুমি জিতে যেতে পারো, গুচ,' বলল মুসা। 'তোমার মাথায় তো অনেক বুদ্ধি।'

'কিন্তু ফোর্থ গ্রেডারদের সাথে কম্পিটিশন করতে হচ্ছে যে,' বলল গুচ। 'জিততে হলে চোখ ধাঁধানো জিনিস চাই।'

কিক বল এখনও শুরু হয়নি। দুই ক্যাপ্টেন টিম বাছাই করছে।

'আমরাও খেলব,' গলা চড়িয়ে বলল কিশোর।

'ঠিক আছে, তোমরা আমার দলে,' ফোর্থ গ্রেডের অন্য সেকশনের এক কিশোর বলল। 'আমরা বুট পাওয়ার কাজে লাগাব।'

'ভূমিকম্প পাওয়ারও কাজে লাগাতে পারো,' স্টিভকে খোঁচা মেরে বলল রুডি।

'বাজে কথা রাখো,' বলে উঠল কিশোর। 'খেলতে এসেছ খেলো।' বলে শট করবার জন্য লাইনে দাঁড়াল।

'লাইব্রেরিতে যেতে হবে,' বলল মুসা। 'সায়েন্স প্রজেক্ট সম্পর্কে ধারণা নেয়ার জন্য। আমার মাথায় তো কিছু আসছে না।'

ডেভিড বুন লাইনের সামনের দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে হাসি নিয়ে

aminsumon@yahoo.com http://www.murchona.com©

ঘুরে দাঁড়াল ও।

'তোমরা খামোকা ভেবে মরছ,' বলল। 'প্রথম প্রাইযটা আমার কপালেই নাচছে।'

'বললেই হলো?' রাগের গলায় বলে উঠল মুসা। 'কই, কখনও তো শুনিনি তুমি বিরাট বিজ্ঞানী!'

'আমার বাবা-মা দু'জনেই বিজ্ঞানী। তাঁরা আমাকে সাহায্য করবেন। আগে দুর্দান্ত কিছু একটা তৈরি করে নিয়ে আসি তারপর বুঝবে।'

তিন গোয়েন্দা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। ওরা চায় না ডেভিড ফার্স্ট প্রাইয জিতুক।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় আমি একটা সায়েন্স ফেয়ারে অংশ নিই,' বলল স্টিভ।

'কী ছিল তোমার প্রজেক্ট—ভূমিকম্প?' রুডি বাঁকা হেসে বলল।

'ওটা হলে খুব সহজেই করে দেখাতে পেরেছে,' খলখল করে হাসি দিল ডেভিড। 'কিছু না, ও শুধু একটু হেঁটে গেলেই হলো—সাক্ষাৎ ভূমিকম্প!' নিজের রসিকতায় হেসে উঠল ডেভিড। 'অ্যাই, আজকে থেকে ওর নাম স্টিভ ভূমিকম্প!'

'সুপার!' চেঁচিয়ে উঠল রুডি। 'স্টিভ ভূমিকম্প। দারুণ!'

'তোমরা ওর মনে কষ্ট দিচ্ছ কেন?' আপত্তি করল জুলি মরগ্যান। 'বেচারা আজকেই প্রথম এসেছে।'

'ওদের কথায় কান দিয়ো না, স্টিভ,' বলল মুসা। 'বিজ্ঞান মেলার জন্য এমন একটা কিছু করো, সবার যাতে তাক লেগে যায়। তাতেই ওদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তোমরা আমার জন্য চিন্তা কোরো না,' বলল স্টিভ। 'আমি ঠিকই এই অপমানের শোধ নেব।'

সামনে এক পা বেড়ে বলে কষে এক লাথি মারল। স্কুলইয়ার্ড পেরিয়ে উড়ে চলে গেল বলটা।

'খাইছে! তোমার পায়ে তো ভীষণ জোর!' সবিস্ময়ে বলে উঠল মুসা।

'আমার ভাইয়েরা ফুটবল খেলে,' জানাল স্টিভ। 'ওরা ছোটবেলা থেকে আমাকে শেখাচ্ছে। হাই স্কুলে যেতে দাও শুধু, তারপর দেখবে রুডিকে কীভাবে ট্যাকল করি!'

তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসল ও।

স্টিভের দিকে চোখ রাখবার দরকার পড়বে না, মনে মনে বলল কিশোর। ও জানে, নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়।

দুই

ছুটির পর তিন গোয়েন্দা বাড়ির পথ ধরল। স্টিভ রয়েছে ওদের সঙ্গে।

'অ্যাই, শোনো না,' বলে উঠল মুসা। 'বিজ্ঞান মেলার জন্যে দারুণ এক প্রজেক্ট মাথায় এসেছে।'

'তোমার সেই অত্যাশ্চর্য খাবার? যেটা খেতে ভাল, পেট ভরবে অথচ ক্যালরি নেই?'

'না, তবে এটাও কম যায় না,' খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে মুসার। 'লাইব্রেরিতে গিয়ে একটা বই উল্টেপাল্টে দেখে এসেছি। ওতে আছে সোলার পাওয়ার ব্যবহার করে কীভাবে হট-ডগ কুকার বানানো যায় তার ডায়াগ্রাম। এরপর আমরা আবার যখন ক্যাম্পিঙে যাব, কাবাব করার জন্যে আগুনের দরকার পড়বে না। আমার সোলার পাওয়ার কুকারটা খুললেই হবে। যখন খুশি হট-ডগ বানাতে পারব।'

'হট আইডিয়া,' বলল রবিন।

'মুশকিলটা হবে রাতের বেলা,' কিশোর বাতলে দিল।

মুখ চুন হয়ে গেল মুসার।

'তোমরা কে কী করছ?' জিজ্ঞেস করল।

'ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতে যা করেছিলাম তাই করব,' বলল স্টিভ। 'তবে তার আগে বড় ভাইদেরকে জিজ্ঞেস করে নেব। ওদের অনেক অভিজ্ঞতা কিনা।'

'তোমরা কয় ভাই?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'চার। আমি সবার ছোট। একজন পড়ে কলেজে, দু'জন হাই স্কুলে,' জানাল স্টিভ। 'আমাকে ওরা পিচ্চি বলে ডাকে।'

ছেলেরা হেসে উঠল।

'তুমি পিচ্চিই বটে,' মন্তব্য করল কিশোর।

'আমার ভাই জিমিকে দেখলে বুঝবে,' হেসে বলল স্টিভ। 'ও কলেজ টিমে ফুটবল খেলে। বিশাল শরীর! ঘরে ঢুকলে মেঝে কেঁপে ওঠে।'

'তোমরা কেউ কিছু ঠিক করেছ কী করবে?' মুসা কিশোর আর রবিনকে উদ্দেশ্য করে জানতে চাইল।

'দারুণ এক আইডিয়া আছে আমার মাথায়,' বলল কিশোর।

'কী আইডিয়া?' স্টিভ প্রশ্ন করল ।

'এখন বলা যাবে না। আগে কাজটা করে নিই।'

'আইডিয়া আমারও আছে। আমিও এখন বলব না,' জানাল রবিন।

রাস্তার শেষ মাথায় পৌঁছে মুসা আর স্টিভের কাছ থেকে বিদায় নিল দুই গোয়েন্দা। রবিন চলল কিশোরের সঙ্গে। বন্ধুর কাছ থেকে একটা ভূতের গল্পের বই ধার নেবে।

'তোমার আইডিয়াটা খুব গোপনীয় মনে হচ্ছে?' বলল রবিন।

'তোমারটাও তো,' পাল্টা বলল কিশোর।

বাড়ি পৌঁছে গেল ওরা। কিশোর হলরুমে বইয়ের ব্যাগ নামিয়ে রাখল। তারপর তরতর করে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। মেরি চাচীর সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়ে গেল ওদের।

'চাচী, জানো, আমাদের স্কুলে না দু'সপ্তা পর সায়েন্স ফেয়ার হবে,' বলল কিশোর। 'তোমরাও দেখতে যেতে পারবে!'

'বাহ, তাই নাকি?' চাচী সোৎসাহে বললেন। 'খুব ভাল কথা। যা, হাত-মুখ ধুয়ে খেতে আয়। রবিন, তুমিও খেয়ে যাবে কিন্তু।'

ডিনারের পর রবিনকে নিয়ে ঘরে এল কিশোর। কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়ল দু'জনেই ওরা একই ধরনের প্রজেক্টের কথা চিন্তা করছে।

'হায় হায়, এখন কী হবে?' কিশোর বলে উঠল। 'মিসেস মোরেল তো কালকে সবাইকে জিজ্ঞেস করবেন কার কী আইডিয়া।'

'আমি লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিয়ে এসেছি,' রবিন বলল।

কিশোরের বিছানায় বসে বইটা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল ওরা।

'বাহ, খুব সুন্দর জিনিস তো,' বইয়ের একটা পাতায় আঙুল রেখে বলল

কিশোর। জিনিসটা একটা ভিউয়ার। এটা ব্যবহার করে সব দিকে দৃষ্টি রাখা যাবে। গোয়েন্দাগিরিতে খুব কাজে দেবে ভিউয়ারটা।

'মজার জিনিস,' বলল রবিন।

'তুমি ইচ্ছা করলে এটা বানাতে পারো।'

'কিন্তু তুমি?' প্রশ্ন করল নথি।

'একটা বুদ্ধি আসছে মাথায়,' বলল কিশোর। 'আমি ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়ে কিছু করার চেষ্টা করব। দুনিয়ার কারও সাথে কারও প্রিন্ট মেলে না জানোই তো। কিন্তু দু'জন যদি রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় হয় তবে?'

'আরে, এটা তো কখনও আমার মাথায় আসেনি,' বলে উঠল রবিন। 'রাশেদ চাচাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে মেলে কিনা।'

'না, আমি নিজেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করে পরীক্ষা করে দেখব,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'একটা এক্সপেরিমেন্ট হয়ে যাক না।'

পরদিন মিসেস মোরেল ওদের কাছে বিজ্ঞান মেলার প্রজেক্টের কথা জানতে চাইলেন। চমৎকার সব আইডিয়া এসেছে ছেলে-মেয়েদের মাথায়। কেউ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে গাছের চারা জন্মাতে চায়, কেউ বা আবার পঞ্চেন্দ্রিয় নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। কেউ কেউ মডেল তৈরি করবে। কিশোর ফিঙ্গারপ্রিন্টের কথা বলল।

'স্টিভ?' মিসেস মোরেল জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি এক গ্লাস পানি দিয়ে ক্যান্ডি বানাব।'

রুডি আর ডেভিড হো-হো করে হেসে উঠল।

'পানি দিয়ে ক্যান্ডি!' হাসির ফাঁকে কোনমতে বলল রুডি।

'ভূমিকম্পের কী উদ্ভট আইডিয়া রে বাবা,' বলল ডেভিড।

মিসেস মোরেল ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ওদের দিকে।

'বিজ্ঞানে উদ্ভট আইডিয়া বলে কিছু নেই, বুঝলে?' বললেন তিনি। 'অসংখ্যবার দেখা গেছে, সামান্য ব্যাপার থেকে যুগান্তকারী কিছু একটা আবিষ্কৃত হয়েছে। ডিশের মধ্যে জন্মানো মোল্ড থেকে যে পেনিসিলিন আবিষ্কার হবে কে ভাবতে পেরেছিল? কাজেই কারও প্রজেক্ট সম্বন্ধে কোন খারাপ মন্তব্য নয়, বুঝতে পেরেছ?'

ডেভিড যতক্ষণ মাথা না ঝাঁকাল অপেক্ষা করলেন তিনি।

'তুমি কী বানাচ্ছ, ডেভিড?'

'সাইসমোগ্রাফ,' গর্বের সঙ্গে জানাল ও।

'কী সেটা?' এক সহপাঠী কৌতূহলী হলো।

'ভূমিকম্প পরিমাপের যন্ত্র,' বলল ডেভিড। 'বাই চান্স ক্লাসে যদি ভূমিকম্প-টম্প কিছু হয়ে যায়!'

মিসেস মোরেলের ভ্রূ তখনও সোজা হয়নি।

'সত্যি বলছ তো, নাকি স্টিভকে খোঁচাচ্ছ?'

'আমি সিরিয়াস্,' বলল ডেভিড। 'আইডিয়াটার জন্য আমি অবশ্য ওর কাছে ঋণী। তবে আমি একটা সত্যিকারের সাইসমোগ্রাফ বানাচ্ছি।'

মিসেস মোরেল মাথা দোলালেন।

'বয়সের তুলনায় অনেক বড় প্রজেক্ট মনে হচ্ছে।'

ডেভিডকে সন্তুষ্ট দেখাল।

'আমি পারব,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানাল।

ওর বাবা-মা ওকে সাহায্য করবেন, মনে মনে বলল কিশোর। তাঁদের বানিয়ে দেওয়া প্রজেক্ট দেখিয়ে ডেভিড যদি প্রাইয জিতে নেয়, তবে সেটাকে আর বিজ্ঞান মেলা বলবার উপায় থাকবে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াবে প্রহসন!

তিন

'আরিব্বাপ, কী সব জিনিস নিয়ে এসেছে!' কিশোরের উদ্দেশে আওড়াল রবিন। ওরা নিজেদের প্রজেক্ট নিয়ে অডিটোরিয়ামে ঢুকছে। মুসা এখনও এসে পৌঁছয়নি।

দু'সপ্তাহ পর। আজ বিজ্ঞান মেলা।

'আমার স্পাইস্কোপ দিয়ে কোন প্রাইয জেতার আশা নেই,' বলল রবিন।

'হয়তো নেই,' সান্ত্বনা দিল কিশোর। 'কিন্তু তুমি তো জানো জিনিসটা তুমি নিজে বানিয়েছ। কোন কোন প্রজেক্ট দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বাবা-মায়েরা হেল্প করেছে।' রবিনকে কনুইয়ের গুঁতো দিল। 'ডেভিডের

সাইসমোগ্রাফটা দেখো। বাজি ধরে বলতে পারি ও বানায়নি।'

অডিটোরিয়ামের দেয়াল ঘিরে লম্বা-লম্বা টেবিল ফেলা হয়েছে। প্রতিটা টেবিলের আলাদা নাম রয়েছে।

দূরের দেয়াল ঘেঁষে মিসেস মোরেলের ক্লাসের জন্য টেবিল সাজানো হয়েছে। পাশেই থার্ড গ্রেডারদের টেবিল।

ডেভিড ফাঁকা এক টেবিলের উপর সযত্নে বসাচ্ছে চমৎকার এক মডেল। টিনের তৈরি হালকা এক খেলনা ক্রেনের মত দেখতে জিনিসটা। লম্বা বাহু থেকে একটা কলম ঝুলে রয়েছে, আলতোভাবে স্পর্শ করেছে কাগজমোড়া একটি ড্রামকে।

'ওটা কীভাবে কাজ করে, কিশোর?' রবিন প্রশ্ন করল।

'সিম্পল। ভূমিকম্প হলে টেবিল কাঁপবে। আর তার ফলে কলমটা দুলবে এপাশ-ওপাশ।

'ড্রামটা ঘুরে গেলে কলমটা হিজিবিজি দাগ কাটবে। তাতে বোঝা যাবে ভূমিকম্পটা কতখানি জোরাল।'

'ড্রামটা ঘুরবে কীভাবে, ডেভিড?' রবিন আবার প্রশ্ন করল।

শ্রাগ করল ডেভিড।

'রাবার ব্যান্ড আছে, অন্যান্য জিনিসও আছে। জটিল ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, তোমার বাবা-মা জিনিসটা ভালই বানিয়েছেন,' বলল কিশোর মনে মনে।

কিশোর ডেভিডের টেবিলের শেষ মাথায় ওর ফিঙ্গারপ্রিন্টের ডিসপ্লে মেলে ধরল। মোট ছটা পরিবার এবং গোটা ক্লাসের সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে ও। দেখা গেছে, পাশের বাড়ির দু'ভাইয়ের ছাপ অনেকটা একই রকমের। এমনকী দু'ভাই-বোনের ফিঙ্গারপ্রিন্টেও মিল রয়েছে।

'অ্যাই, কিশোর, দেখে যাও,' ডাকল রবিন।

পাশের টেবিলে রাখা এক খেলনা রোবট আঙুল দিয়ে দেখাল রবিন।

'গ্রাহাম গুচ বানিয়েছে,' বলল।

'খেলনা রোবট?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'না। বার্গলার অ্যালার্ম। রোবটের শরীরে বসিয়েছে যাতে চোরেরা কিছু টের না পায়। সুন্দর না?'

লাজুক হাসল গুচ।

'এটা থেকে ফটো ইলেকট্রিক বিম বেরোয়। কেউ বিম ভাঙলে, বেল বেজে ওঠে এবং ক্যামেরা আগন্তুকের ছবি তুলে নেয়।'

'ও দিয়ে কোন কাজ হবে না,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল ডেভিড। 'একগাদা তার আর বেল দিয়ে কোত্থেকে একটা জবরজং বানিয়ে নিয়ে এসেছে!'

'কাজ হবে কি হবে না সেটা জাজরাই দেখে বিচার করবেন,' শান্ত সুরে বলল শুচ।

'তারমানে? আমাদের প্রজেক্টগুলো ডেমনস্ট্রেট করে দেখাতে হবে নাকি?' ডেভিড প্রশ্ন করল।

'নিশ্চয়ই। কেন, জানতে না তুমি?' পাল্টা বলল শুচ। 'লাঞ্চের পর সবাইকে ব্যাখ্যাসহ যার যার জিনিস ডেমনস্ট্রেট করতে হবে।'

'লাঞ্চের পর যেন ভূমিকম্প হয় এই দোয়াই করতে থাকো,' ডেভিডের উদ্দেশে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'স্টিভকে হাঁটাতে হবে যন্ত্রটার পাশ দিয়ে,' বলল ডেভিড। কিশোর আর রবিনের কাছ থেকে সরে গেল। 'অ্যাই, ভূমিকম্প,' হাঁক ছাড়ল। 'কী বানিয়েছ আমাদের দেখাবে না!'

স্টিভের প্রজেক্ট বলতে এক গ্লাস পানি, যার উপর দিকে শুইয়ে রাখা একটা আইসক্রিমের কাঠি। কাঠিটা থেকে একটা তার ঝুলছে পানির ভিতরে।

ডেভিড কপট হাসিতে ফেটে পড়ল।

'এই জিনিস বানিয়ে নিয়ে এসেছ? ফালতু যতসব!' তীব্র অবজ্ঞার সঙ্গে বলল। 'অ্যাই শোনো, আমার সাইসমোগ্রাফের ধারে-কাছেও যাবে না। কী হলো, শুনতে পাচ্ছ? আমি চাই না যন্ত্রটা এখনই চালু হয়ে যাক। খুব সূক্ষ্ম জিনিস কিনা।'

লাঞ্চের সময় দেখা গেল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি হবে।

'এটা একটা কথা হলো!' মুসা হাহাকার করে উঠল। 'রোদই যদি না থাকল তো আমি সোলার পাওয়ার কুকার ডেমনস্ট্রেট করব কী করে? ভাগ্যিস, কালকে কয়েকটা হট-ডগ বানিয়ে রেখেছিলাম। জাজদেরকে সেগুলো অন্তত দেখানো যাবে।'

'উহ্, ঠাণ্ডায় তো জমে গেলাম!' বলল রবিন।

'আমিও,' বলল মুসা। 'যাই, কাবার্ড থেকে আমার মাফলারটা নিয়ে

আসিগে। ভয়ানক শীত করছে।'

'ইয়োওওওও!' রুডি, ডেভিড আর ওদের বন্ধুরা মুখে এরোপ্লেনের শব্দ তুলে দৌড়ে গেল। একজনের হাতের ধাক্কায় মাথা থেকে ক্যাপ পড়ে গেল রবিনের।

'এসব কী!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

হা-হা করে হাসতে লাগল ছেলেগুলো।

জুলি মরগ্যান ওর ছোট বোন জিনা মরগ্যান আর বান্ধবীদের নিয়ে গাদাগাদি করে বসে ছিল বিল্ডিঙের কাছে, ঠাণ্ডা বাতাসের কবল থেকে বাঁচতে। রুডি আর ডেভিড ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'আরে, জবর জিনিস তো,' ডেভিড চেঁচিয়ে উঠে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল জিনার হাতে ধরা পুতুলটা। 'বাঁচাও, বাঁচাও, ছিনতাইকারী!' পরমুহূর্তে নিজেই গলা চিকন করে চেঁচাতে লাগল।

ছোট বোনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল জুলি।

'দিয়ে দাও বলছি!' পুতুলটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করল ও।

ডেভিড হেসে উঠে, জুলির নাগালের বাইরে তুলে ধরে রাখল ওটা। ওদিকে জিনার তখন কাঁদো-কাঁদো অবস্থা।

কিশোর আর রবিন সাহায্য করতে যাবে, এসময় ডেভিডের হাত থেকে জুলি ছিনিয়ে নিতে পারল পুতুলটা।

'অসভ্য!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল। 'আগে কাবার্ডে পুতুলটা রাখি, তারপর বুঝবে মজা!'

বোনকে হাত ধরে টানতে টানতে কোনা ঘুরল ও। সামনের প্রবেশদ্বারের উদ্দেশে এগোচ্ছে।

'ও তোমার নামে ঠিক বিচার দেবে দেখো,' ডেভিডকে বলল রুডি।

'আরে ধুর,' বলে জুলির পিছু পিছু দৌড় দিল ডেভিড।

'বাস্কেটবল ছুঁড়বে নাকি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল রবিনকে।

মাথা নাড়ল রবিন।

'ঠাণ্ডায় আঙুল জমে গেছে।'

'অ্যাই, স্টিভ, চললে কোথায়?' স্টিভকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে গলা চড়িয়ে বলল কিশোর।

'একটা বাচ্চা বলল আমাকে নাকি অফিসে ডেকেছে,' বলে তড়িঘড়ি

চলে গেল ও।

'যাক, বাবা, বেল বেজেছে,' স্বস্তির শ্বাস ফেলে বলল রবিন। 'ভেতরে গিয়ে একটু গরম হওয়া যাবে।'

কিন্তু সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই, ইয়ার্ডে ডিউটিরত টিচারের সঙ্গে দেখা হলো।

'লাঞ্চটাইম তো এখনও শেষ হয়নি,' জানালেন ভদ্রমহিলা।

'কিন্তু আমরা যে বেল শুনলাম,' বলল রবিন।

ঘড়ি দেখলেন টিচার।

'তোমরা ভুল করছ। আরও পাঁচ মিনিট সময় বাকি আছে।'

বিস্মিত রবিন ঘুরে দাঁড়াল।

'তুমিও শুনেছ না, কিশোর?'

'শুনেছি তো,' চিন্তামগ্ন গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠস্বর।

স্টিভ আর মুসা এসময় ফিরে এল ওদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য।

'তোমার মাফলার কোথায়?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'মাফলার? ও, ভুলে গেছি,' বলল মুসা।

'কিন্তু তুমি তো মাফলার আনতেই গেলে।'

অপ্রস্তুত শোনাল মুসার হাসিটা।

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

ঠিক এমনি সময় বেলের জোরাল শব্দ শোনা গেল। একটু পরে ছেলেরা সারি বেঁধে প্রবেশ করল ভিতরে।

সেদিন বিকেল গড়াবার পর, থার্ড ও ফোর্থ গ্রেডাররা উত্তেজিত ভঙ্গিতে অডিটোরিয়ামে জড় হতে শুরু করল।

'যার যার প্রজেক্টের পাশে শান্ত হয়ে দাঁড়াও তোমরা,' প্রিন্সিপাল মিসেস গাওয়ার বললেন। 'আর কেউ কোন কিছুতে হাত দিয়ো না। জাজরা এখুনি এসে পড়বেন। তোমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করো।'

কিশোর ওর টেবিলের কাছে চলে এল। ডেভিড ওর পাশ কাটাল। হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'একী!' চেঁচিয়ে উঠল ডেভিড। 'হায়, হায়! আমার এত কষ্টের প্রজেক্ট ভেঙে দিল!'

সবাই ঘুরে দাঁড়াল ব্যাপারটা কী দেখবার জন্য।

ডেভিডের সাইসমোগ্রাফটা ভেঙেচুরে পড়ে আছে। অর্ধেকটা টেবিলের উপর, বাকি অর্ধেকটা মেঝেতে।

শুচের বার্গলার অ্যালার্মটারও দফারফা। চুরমার হয়ে পড়ে আছে সাইসমোগ্রাফের পাশে।

কে করল এই জঘন্য কাজটা?

চার

লাঞ্চ পিরিয়ডে আমার বার্গলার অ্যালার্মের বেল বেজে উঠতে শুনেছিলাম,' ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল শুচ। 'এখন বুঝতে পারছি, কেন। কে করল এই শত্রুতাটা?'

রবিনের গলা শুকিয়ে এল। বেচারী শুচ কী পরিমাণ পরিশ্রম করেছে প্রজেক্ট দাঁড় করাতে, জানে সে। জিনিসটা প্রাইয জিততই, কোন সন্দেহ নেই ওর মনে।

মিসেস মোরেল এগিয়ে এলেন ক্ষতিগ্রস্ত প্রজেক্ট দুটো দেখতে। মিসেস গাওয়ার রয়েছেন তাঁর সঙ্গে।

'দিস ইয হরিবল!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন মিসেস গাওয়ার। 'কাজটা যে-ই করে থাকুক ইচ্ছে করে করেছে। শুচ, ডেভিড, তোমরা চিন্তা কোরো না, অপরাধীকে খুঁজে বের করে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।'

'আমি জানি কে অপরাধী,' বলল ডেভিড।

ছেলে-মেয়েরা এতক্ষণ উত্তেজিতভাবে ফিসফাস করছিল। এবার সবাই নিশ্চুপ হয়ে গেল। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ডেভিডের দিকে।

'আর কে, স্টিভ ম্যাকগ্রা ছাড়া?' বলে চলল ডেভিড। 'লাঞ্চ পিরিয়ডে ওকে বিল্ডিঙে ঢুকতে দেখেছি আমি। ও আমার ওপর শোধ নেয়ার জন্যে এটা করেছে। আমি যে এতদিন ওকে খুঁচিয়েছি, তাই।'

'কিন্তু ও শুচের প্রজেক্ট ভাঙতে যাবে কেন?' প্রশ্ন করল কিশোর। 'শুচ তো ওর পিছে লাগতে যায়নি।'

http://www.murchona.com ©amsumon@yahoo.com

'আমি জানি কী ঘটেছে,' বলল রুডি। ডেভিডের প্রজেক্টের পাশে এসে দাঁড়াল। 'ভূমিকম্প এখানে আসার পর ওর গায়ের ধাক্কা লেগে পড়ে যায় জিনিসটা। ইচ্ছে করে করেছে বলছি না। ও কীরকম জবরজং কিসিমের ছেলে সেটা সবাই জানে।'

'অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ,' মিসেস গাওয়ার বললেন। 'স্টিভ এ ব্যাপারে কী বলে শোনা যাক।'

মিসেস গাওয়ার স্টিভের দিকে চাইলেন। ফুটকি ভরা মুখটা ওর রাঙা হয়ে গেছে।

'ওরা যা বলল তার কোনওটা কি সত্যি, স্টিভ?' শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'তুমি কি লাঞ্চ টাইমে এখানে এসেছিলে?'

'জি, আ-আমি স্কু-স্কুল বিল্ডিঙে এ-এসেছিলাম, কিন্তু—' তোতলাতে লাগল স্টিভ।

'আমি বললাম না!' ডেভিড চেঁচিয়ে উঠল।

'তুমি কি এখানে এসে এই প্রজেক্টগুলো ফেলে-টেলে দিয়েছিলে?' মিসেস মোরেল জবাব চাইলেন। 'ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকলে আমরা মেনে নেব, কিন্তু আমাদেরকে সত্যি কথাটা জানতে হবে।'

ঘরটার চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল স্টিভ।

'জি না,' বলল। 'আমি এ ঘরে আসিইনি। বিল্ডিঙের ভিতরেও আসতাম না। এসেছিলাম শুধু একটা বাচ্চা ছেলের কথায়। ও বলল আমাকে কে নাকি অফিসে ডেকে পাঠিয়েছে। এক্ষুণি যেতে হবে।'

'কে বলেছিল?' ডেভিড জানতে চাইল।

স্টিভ আশপাশে দৃষ্টি বুলাল।

'আমি চিনি না। ছোট ছেলে-ফার্স্ট গ্রেডার হতে পারে। ও এসে বলল আমাকে অফিসে ডাকছে।'

'কেন?' মিসেস মোরেলের প্রশ্ন।

শ্রাগ করল স্টিভ।

'খবরটা ভুল ছিল। সেক্রেটারি বললেন উনি আমাকে ডেকে পাঠাননি।'

'হাহ!' তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে বলল রুডি। 'ভাল অজুহাত খাড়া করেছে ভূমিকম্প। ফালতু সময় নষ্ট না করে বলে ফেলছ না কেন, কাজটা তোমারই?'

'তুমি চুপ করো, রুডি,' কঠোর গলায় আদেশ করলেন মিসেস মোরেল।

'কোন প্রমাণ নেই স্টিভই কাজটা করেছে। প্রমাণ ছাড়া তুমি কাউকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারো না।'

মিসেস গাওয়ার হাত উঁচু করলেন।

'সবাই যার যার ক্লাসরুমে ফিরে যাও,' বললেন। 'এ ব্যাপারে তদন্ত প্রয়োজন। সেজন্যে সময় লাগবে। প্রতিযোগিতা আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হলো। আমরা আশা করছি শীঘ্রিই ব্যাপারটার ফয়সালা করতে পারব। এখন সবাই যার যার ক্লাসে যাও।'

স্টিভ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিশোর আর মুসা ওর কাঁধে হাত রাখল। 'চলো, স্টিভ,' বলল মুসা।

স্টিভ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে রুডি আর ডেভিডের দিকে।

'ওদের কথা সবাই বিশ্বাস করেছে, কিশোর,' বলল ধরা গলায়। 'আমি কী করে প্রমাণ করব আমি নির্দোষ?'

'আমরা তোমাকে সাহায্য করব, স্টিভ। তুমি কোন চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

রবিনের কাছে চলে এল ও।

'রবিন,' গলা খাদে নামিয়ে বলল কিশোর। 'আমাদেরকে ক্লুর খোঁজে এখানে থাকতে হবে। গুচের ভাঙা রোবটের টুকরোর মধ্যে কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

'ভাল আইডিয়া,' বলল রবিন। গুচের কাছে এগিয়ে গেল ও। 'তুমি চাইলে আমি তোমাকে এগুলো তুলতে সাহায্য করতে পারি। এমনকী তোমার বার্গলার অ্যালার্মটাও হয়তো সারিয়ে ফেলা সম্ভব।'

'মনে হয় না,' বলল গুচ। 'তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।'

মিসেস মোরেল এসময় কিশোরকে ডাকলেন।

'কিশোর,' ওঁকে একপাশে নিয়ে গেলেন টিচার। 'তোমরা তো গোয়েন্দা। অনেক রহস্যের সমাধান করেছ। আমি চাই তোমরা এই রহস্যটারও কিনারা করো। কী, পারবে না?'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল গোয়েন্দাপ্রধান।

'চেষ্টা করব, ম্যাডাম,' বলল।

'তোমাকে পারতেই হবে,' জোর দিয়ে বললেন মিসেস মোরেল। 'আমি জানি তুমি পারবে।'

মিসেস মোরেল তিন গোয়েন্দাকে তদন্তের স্বার্থে অডিটোরিয়ামে থাকবার অনুমতি দিলেন–শুচ আর ডেভিডের সঙ্গে।

'কিশোর, আমি বরং স্টিভের সাথে থাকি,' বলল মুসা। 'বেচারী ভেঙে পড়েছে।'

আপত্তি করল না গোয়েন্দাপ্রধান।

সবাই অডিটোরিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে গেল। শুধু কিশোর, রবিন, শুচ আর ডেভিড ফিরে এল ভাঙা প্রজেক্ট দুটোর কাছে।

'তোমার প্রজেক্টটা নষ্ট হলো বলে আমার খারাপ লাগছে,' শুচের উদ্দেশে বলল ডেভিড। 'তুমি চাইলে ওটা সারাতে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'ধন্যবাদ, ডেভিড। তবে এটা আর মেরামত করা যাবে না। তোমারটার কী অবস্থা?' বলল শুচ।

কিশোর অবাক হলো। ডেভিড বুনের মত একটা দুর্মুখ ছেলে এত মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলছে কোন্ উদ্দেশ্যে? তাও আবার থার্ড গ্রেডের এক ছাত্রের সঙ্গে?

'একই,' বলল ডেভিড। হাঁটু গেড়ে বসল ওটার পাশে। 'কত টুকরো হয়েছে দেখো না।' মাথা নাড়ল ও। 'ব্যাপারটা আমার মাথায় আসছে না। আমার ওপর ভূমিকম্পের না হয় রাগ আছে, কিন্তু তোমার সাথে কী।'

'স্টিভই কাজটা করেছে তোমাকে কে বলল,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কিশোর।

'ও ছাড়া আর কে?' খেঁকিয়ে উঠল ডেভিড।

'জানার একটাই উপায় আছে,' বলল কিশোর। ওর ফিঙ্গারপ্রিন্টের সরঞ্জাম থেকে এক শিশি ট্যালকম পাউডার আর খানিকটা আঠাল টেপ নিয়ে ফিরে এল।

'কী করছ?' ডেভিড জিজ্ঞেস করল।

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাই কিনা দেখছি,' জানাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'গোটা ক্লাসের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে আমার প্রজেক্ট বোর্ডে। স্টিভের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এখানে পাওয়া যাবে, ও যদি এগুলো ভেঙে থাকে।'

টুকরোগুলোর উপর পাউডার ছিটাল ও, তারপর ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। এবার হালকা ব্রাশ করতে ফিঙ্গারপ্রিন্টের নমুনা বেরিয়ে এল। আঠাল টেপটা সেঁটে দিতে পাওয়া গেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট।

ঘোঁত করে তাচ্ছিল্যের শব্দ করল ডেভিড।

'তোমার গোয়েন্দা-গোয়েন্দা খেলা বন্ধ করো তো,' দাবড়ে উঠল। 'কয়েকটা রহস্যের কিনারা করেছ বলে নিজেকে শার্লক হোমস মনে করো, না?' এক মুঠো ভাঙা টুকরো তুলে নিয়ে ধপ করে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল। 'আমি চললাম।'

কিশোর ওকে অডিটোরিয়াম ত্যাগ করতে দেখল।

রবিন উবু হয়ে বসে ছিল শুচের পাশে। বার্গলার অ্যালার্মের ভাঙা অংশগুলো উঠাচ্ছিল। হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠে থাবা দিয়ে কী একটা তুলে নিল।

'কী ওটা?' কিশোর জিজ্ঞেস করল। 'কিছু পেলে নাকি, রবিন?' ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করছে ও।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। মুঠো খুলল। দেখা গেল ওর তালুতে এক পাটি জুতো–এতই ছোট, নির্ঘাত কোন পুতুলের পা থেকে খসে পড়েছে।

পাঁচ

'মনে পড়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জুলি মরগ্যানের বোন পুতুল নিয়ে এসেছিল। ডেভিড ওটা কেড়ে নিয়ে জ্বালাতন করছিল।'

'জুলি ওর বোনের পুতুলটা ভেতরে রাখার জন্যে চলে আসে,' যোগ করল রবিন। 'ও এখানে এসে প্রজেক্ট দুটো ভেঙে দিয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু কেন?' শুচের জিজ্ঞাসা।

'ডেভিডের উপর শোধ নেয়ার জন্য,' বাতলে দিল রবিন।

কিশোর মাথা নাড়ল।

'জুলি অতটা নীচে নামবে না। তা ছাড়া, শুচের সাথে ওর কীসের শত্রুতা?'

'নিজে হয়তো ফার্স্ট প্রাইযটা জিততে চেয়েছে,' বলল রবিন।

কিশোর দ্বিধান্বিত। নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। ওর মনে পড়ল, জুলি বলেছিল বড়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বিজ্ঞান মেলার প্রাইয জেতা সম্ভব নয়। জুলি কি তবে জিতবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল? কিন্তু এ ধরনের কাজ

http://www.murchona.com
mhsiron@yahoo.com

করবার মত মেয়ে তো জুলি নয়।

'ও এ কাজ করবে না,' ঘোষণা করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'যে করেছে সে রাগের মাথায় করেছে। দেখছ না, প্রজেক্ট দুটো কেমন চুরমার করে দিয়েছে?'

'আরও কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা দেখি,' বলল রবিন।

'আমি আরও কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেব,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'তোমরা ক্লু খুঁজতে থাকো।'

'আরে!' হঠাৎ বলে উঠল রবিন।

'কী?' কিশোর আর গুচ মুখ তুলে চাইল।

'মেঝেতে দেখতে পাচ্ছ?' রবিন বলল।

কীসের যেন গুঁড়ো পড়ে রয়েছে মেঝেতে। রবিন ঝুঁকে পড়ে ছোট একটা টুকরো তুলে নিল। শুঁকে দেখল।

'চিপসের গুঁড়ো,' বলল রবিন। 'গন্ধটা নাচো চীয ফ্লেভারের। লাঞ্চটাইমে স্টিভ আর মুসা যেটা খায়।'

'এবং স্টিভ বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকেছিল,' মনে করিয়ে দিল গুচ। 'ওকে কে নাকি অফিসে ডেকেছিল।'

'আর মুসা গেছিল মাফলার আনতে,' কিশোর বলল। 'বেরিয়ে আসে মাফলার ছাড়া। ও যেহেতু বিল্ডিঙে ঢুকেছিল, ওকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো কোন সূত্র পাওয়া যেতে পারে।'

'তবে কি স্টিভ?' শান্ত স্বরে বলল রবিন। 'ও চিপস খাচ্ছিল। তা ছাড়া ডেভিডের ওপর খেপার ওর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। আমাদেরকে বলেওছে শোধ নেবে।'

'রুডি আর ডেভিড তো প্রথম থেকেই বলে আসছে একথা,' বলল কিশোর। 'স্টিভ হয়তো এখানে এসেছিল, তারপর অ্যাক্সিডেন্টালি প্রজেক্ট দুটো ভেঙে ফেলেছে। সবাই জানি, ব্যাপারটা অসম্ভব নয়।'

'হয়তো স্বীকার করতে সাহস পায়নি,' বলল রবিন। 'ওর সাথে কথা বলতে হবে। আমাদেরকে হয়তো সত্যি কথাটা বলবে।'

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'কিন্তু পুতুলের জুতোটার কী ব্যাখ্যা?'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'তাই তো। ওটা এখানে কেন?'

'রহস্যটা জটিল হয়ে উঠছে,' বলল কিশোর। 'কে করল কাজটা?' উঠে দাঁড়াল ও। হাতে খানিকটা টেপ। 'বেশ কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট জোগাড় করা গেছে,' বলল। 'দেখা যাক কার সাথে মেলে।'

গুচ ওর বার্গলার অ্যালার্মের টুকরোগুলো জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করছিল। রোবটের মাথাটা এক হাতে আর দেহটা অপর হাতে ধরা। অসংখ্য তার বেরিয়ে এসেছে যন্ত্রটা থেকে।

'মেরামত করতে পারবে?' রবিন জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল গুচ।

'মনে হয় না। একেবারে বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে।'

রবিন হেঁটে এল কিশোরের কাছে।

'কিছু জানা গেল?'

টেপটা তুলে ধরে বোর্ডের প্রিন্টের সঙ্গে ফিঙ্গারপ্রিন্টগুলো মিলিয়ে দেখছে কিশোর।

'নাহ। ডেভিডের সাইসমোগ্রাফে শুধু ওর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পেলাম।'

'তাতে অবশ্য কিছু প্রমাণ হয় না,' বলল রবিন। 'স্টিভের গায়ের ধাক্কা লেগে যদি প্রজেক্ট দুটো পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে তো সাইসমোগ্রাফ ছোঁয়ার দরকার পড়ে না। তা ছাড়া লাঠি-টাঠি দিয়েও ভেঙে দিয়ে থাকতে পারে অপরাধী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল কিশোর।

'সত্যি কথা। আর তা ছাড়া বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ের হাতেই গ্লাভস দেখা গেছে লাঞ্চটাইমে। কাজেই তারাও ফিঙ্গারপ্রিন্ট রেখে যায়নি।'

'কিন্তু তা হলে আমরা এগোব কীভাবে? জুলি আর স্টিভকে জেরা করবে?'

এ সময় গুচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলে সচকিত হলো কিশোর আর রবিন।

'কী! কী হলো?' রবিন জবাব চাইল।

'এই দেখো!' গুচের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'বার্গলার অ্যালার্ম ধ্বংস হলেও ভিতরের ক্যামেরাটা ঠিক আছে। ভাগ্যিস ওটাকে রোবটের মাথায় সেট করেছিলাম। ক্যামেরাটা ঠিকমত কাজ করে থাকলে, যে এই দুষ্কর্মটা করেছে তার ছবি উঠেছে!'

http://www.murchona.com

ছয়

স্কুল ছুটির পর।

'এখনই বাসায় যাচ্ছি না আমরা,' রবিনকে বলল কিশোর। 'কয়েকজনকে ইন্টারোগেট করতে হবে।'

সানন্দে রাজি হলো রবিন।

'আগে মুসার সাথে কথা বলা দরকার,' বলল। 'ও হয়তো কোন সূত্র-টুত্র দিতে পারবে।'

মুসাকে স্কুল থেকে বেরোতে দেখা গেল। বন্ধুদের দেখে হাসল ও।

'যাক, আছ তা হলে। আমি তো ভেবেছিলাম আমাকে ফেলে চলে গেছ বুঝি।'

'না,' বলল কিশোর। 'তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসেছি অন্য কারণে। কয়েকজনের সাথে কথা বলতে চাই।'

'কী ব্যাপারে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'বিজ্ঞান মেলার ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ, কে ভাঙল প্রজেক্ট দুটো তদন্ত করে বের করা দরকার,' বলল মুসা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল রবিন।

'সবার ধারণা কাজটা স্টিভ করেছে। এটা ঠিক না। তোমার কী মনে হয়, কিশোর?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'ইচ্ছে করে করেনি,' মতামত জানাল গোয়েন্দাপ্রধান। 'হয়তো অ্যাক্সিডেন্টালি করে ফেলেছে, বলতে সাহস পাচ্ছে না।'

'ও ভীতু ছেলে না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল মুসা। 'ও অডিটোরিয়ামে যায়নি আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

'আচ্ছা?' কিশোর বলে উঠল। 'তুমি জানলে কী করে?'

'জানলাম কারণ···কারণ ও বলেছে যায়নি। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করেছি আমি,' বলল মুসা।

কিশোর রবিনের দিকে এক ঝলক চাউনি বুলাল। দেখা যাচ্ছে স্টিভ ম্যাকগ্রা ইতোমধ্যে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু জুটিয়ে ফেলেছে।

এ সময় ছোট বোন আর বান্ধবীদের নিয়ে বেরিয়ে এল জুলি মরগ্যান।

'ওই যে, জুলি আসছে, ওর সাথে কথা বলবে না?' বলল রবিন।

'ওকেও কি সন্দেহ করছ নাকি?' মুসা প্রশ্ন করল গলা চড়িয়ে।

কিশোর ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকাল। জুলিকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরতে চেয়েছিল গোয়েন্দাপ্রধান। ভাগ্য ভাল, বান্ধবীদের সঙ্গে হাসিতে-গল্পে মশগুল ছিল মেয়েটি। মুসার কথা শুনতে পায়নি।

কিশোর এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির বাহুতে আলতো চাপড় দিল।

'তোমার সাথে একটু কথা ছিল, জুলি।' এক পাশে সরিয়ে নিয়ে গেল।

বিস্মিত দেখাল জুলিকে।

'কী ব্যাপারে?'

'বিজ্ঞান মেলা,' বলল কিশোর। 'মিসেস মোরেল কেসটা আমাদের হাতে দিয়েছেন।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল জুলি।

'ও আচ্ছা, মনেই ছিল না,' বলল। 'তোমরা তো আবার বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দা!'

রবিন কিশোরের পাশে এসে দাঁড়াল।

'আমরা জানি লাঞ্চটাইমে তুমি স্কুল বিল্ডিঙে ঢুকেছিলে।'

'হ্যাঁ, তো কী হলো? আমার বোনের পুতুলটা কাবার্ডে রাখতে গেছিলাম।'

'নিশ্চয়ই কোন কিছু চোখে পড়েছে তোমার?' রবিন প্রশ্ন করল।

'কিছু বলতে কী?'

'এই যেমন, কাউকে গোপনে অডিটোরিয়ামে ঢুকতে দেখা?' কিশোর বাতলে দিল।

জুলি মাথা নাড়ল।

'আমি কাউকে দেখিনি। পুতুল রেখে সোজা বেরিয়ে এসেছি।'

'পুতুলটা সঙ্গে আছে?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফুটল জুলির মুখের চেহারায়।

'হ্যাঁ।'

'দেখাবে একবার?' রবিন কথার খেই ধরল।

'কেন?' বলে বান্ধবীদের দিকে চাইল জুলি। 'শোনো, আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। তোমাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারছি না, সরি।'

রবিন ওর ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। তালুর উপর পুতুলের জুতোটা।

'তোমাদের পুতুলের জুতো হারিয়েছে?'

জুলির চোখে-মুখে এতক্ষণে ভীতি ফুটে উঠল।

'ওটা কোথায় পেলে?' প্রশ্ন করল।

'অডিটোরিয়ামে। ভাঙা প্রজেক্ট দুটোর পাশে।' সরাসরি জানিয়ে দিল রবিন।

'আমি বলছি,' ত্বরিত বলল জুলি। 'আমি অডিটোরিয়ামের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দরজা খোলা দেখে ভেতরে উঁকি দিই। দেখি আমার বোর্ডের ওপরে যে সাইনটা রয়েছে সেটা কাত হয়ে গেছে। বিকেলে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে, তাই ছুটে গিয়ে ওটা সোজা করে দিই। জুতোটা তখন হয়তো পড়ে গেছে।'

'যেতে পারে, কিন্তু ডেভিড আর গুচের প্রজেক্ট দুটো?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'আমি ছুঁয়েও দেখিনি। আমি যখন বেরিয়ে আসি ও দুটো ঠিকই ছিল।'

'ধন্যবাদ, জুলি,' বলল কিশোর। 'অনেক উপকার হলো। এখন অন্তত শিয়োর হওয়া গেল ঘটনাটা ঘটেছে লাঞ্চটাইমের শেষের দিকে।'

'আমরা গুচের বার্গলার অ্যালার্মের বেল বাজতে শুনেছিলাম।' রবিনের কণ্ঠে উত্তেজনা। 'আমরা ভাবি লাঞ্চ পিরিয়ড শেষ, কিন্তু ইয়ার্ড টিচার বলেন তখনও পাঁচ মিনিট বাকি। তার অর্থ, প্রজেক্ট দুটো লাঞ্চটাইম শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে ভাঙা হয়েছে।'

'হলরূমে কারও সাথে দেখা হয়েছিল তোমার?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'বলেছি তো, হয়নি। তবে স্টিভকে অফিসে দেখেছি। আমি এখন যাচ্ছি।'

বান্ধবীদের সঙ্গে যোগ দিতে গেল জুলি।

রবিন তাকাল কিশোরের দিকে।

'জুলি যখন বেরিয়ে আসে স্টিভ তখনও ভেতরে। ওর পক্ষে অডিটোরিয়ামে যাওয়া অসম্ভব না।'

'ওই যে স্টিভ আসছে,' বলল কিশোর।

এগিয়ে গিয়ে স্টিভের কোমর জড়িয়ে ধরল ও। ওকে দেখে চওড়া হাসি ফুটল স্টিভের মুখে।

'হ্যাঁ, কিশোর! বের করতে পারলে অপকর্মটা কে করেছে?'

'এখনও পারিনি, তবে অনেক দূর এগিয়েছি। আচ্ছা, তুমি লাঞ্চটাইমে কী কী করেছ আরেকবার বলবে?'

নাক কুঁচকে স্মৃতি হাতড়াতে লাগল স্টিভ।

'তোমাদের সাথে স্কুলইয়ার্ডে ছিলাম,' বলল। 'তারপর একটা ছোট বাচ্চা এসে আমাকে অফিসে যেতে বলল।'

'ও কি তোমার নাম জানত?' রবিন প্রশ্ন করল। 'তুমিই যে স্টিভ ও জানল কীভাবে?'

শ্রাগ করল স্টিভ।

'আমি জানতে চাইনি। যেতে বলেছে গেছি।'

'তারপর?' রবিন প্রশ্ন করল।

'অফিসে যাওয়ার পর ওরা বলল আমার ভুল হয়েছে। কেউ আমাকে ডেকে পাঠায়নি। ব্যস, বেরিয়ে এলাম।'

'অডিটোরিয়ামের আশপাশে যাওনি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল।

'কেন যাব?' পাল্টা বলল স্টিভ। 'তোমরাও জানো আমি ওরকম জঘন্য কাজ করার মত ছেলে না।'

'ডেভিড তোমার সাথে অনেক দুর্ব্যবহার করেছে,' বলল কিশোর। 'ওকে শায়েস্তা করার জন্যে—'

'তুমি বলেছিলে একদিন শোধ নেবে,' বাকিটুকু যোগ করে দিল রবিন।

'আমি ওভাবে বলিনি,' সাফাই দিল স্টিভ। দাঁত বের করে হাসল। 'কথাটা আমার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছি। ফুটবল মাঠে হার্ড ট্যাকল করতে বলে ও। তোমাদেরকে তো বলেছি আমার ভাই কলেজের নাম করা প্লেয়ার। কেউ আমার সাথে দুর্ব্যবহার করলেই মাথার মধ্যে ওর কথাগুলো ঘুরতে থাকে। শোধ বলতে খেলার মাঠে সুযোগ পেলে কড়া ট্যাকল করা আরকি।'

'অফিস থেকে বেরিয়ে এসে কী করলে?' রবিন প্রশ্ন করল। 'হলরূমে কাউকে দেখেছিলে?'

'শুধু মুসাকে,' জানাল স্টিভ। 'আমরা একসাথে বাইরে বেরিয়ে আসি।'

কিশোর আর রবিন মুসার দিকে ঘুরে তাকাল।

'মুসা, তুমি মাফলার আনার কথা বলে ভেতরে গিয়েছিলে, কিন্তু আনোনি,' বলল কিশোর।

'বোকামি হয়ে গেছে,' বলে হাসবার চেষ্টা করল মুসা।

'অডিটোরিয়ামে ভাঙা প্রজেক্টের পাশে আমরা কী পেয়েছি জানো?' প্রশ্ন করল রবিন। তারপর নিজেই জবাব দিল। 'চিপসের গুঁড়ো। নাচো চীয চিপস। তুমি যেটা পছন্দ করো।'

মুসার মুখ-চোখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'আমরা তোমাকে সন্দেহ করছি না, মুসা,' বলল কিশোর। 'আমরা জানি তুমি অমন কাজ করতে পারো না। কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন করে তোমার তো একটা সাফাই দেয়া দরকার। নইলে অন্যরা তো তোমাকে সন্দেহ করবে।'

'অডিটোরিয়ামে তুমি কী করছিলে?' রবিন বলল।

'বলছি। ব্যাপারটা বিব্রতকর, তাই চুপ মেরে থাকতে চেয়েছিলাম,' কাঁচুমাচু হয়ে বলল মুসা।

কিশোর, রবিন আর স্টিভের দৃষ্টি বন্ধুর মুখের উপর সেঁটে রয়েছে। লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেছে মুসার চোখ-মুখ।

'সত্যি বলতে কী, লাঞ্চের পরও খিদে মেটেনি আমার। তখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার সোলার হট-ডগ কুকারের কথা। তিনটে হট-ডগ ছিল ওটার মধ্যে। ভেবে দেখলাম ডেমনস্ট্রেশনের জন্যে তিনটের কী দরকার। তাই আরকি চুরি করে ঢুকে একটা সেঁটে দিই।'

'প্রজেক্ট দুটো কি তখন ভেঙে পড়ে আছে?' গোয়েন্দাপ্রধান জানতে চাইল।

মাথা নাড়ল মুসা।

'জানি না। আমি খাওয়ায় ব্যস্ত ছিলাম। লক্ষ করিনি।'

'চোখ কান খোলা রেখেও তো খাওয়া যায়,' তিরস্কারের সুর কিশোরের কণ্ঠে।

'সরি,' লজ্জিত গলায় বলল মুসা।

স্কুল গেটের উদ্দেশে পা বাড়াল ওরা।

'দেখা যাচ্ছে তদন্ত তেমন কিছুই এগোয়নি,' বলল কিশোর। 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট

পাইনি। যারা ভেতরে ঢুকেছিল তাদের সাথে শুধু কথা বলেছি। এবং তাদের সবার কথায় যুক্তি আছে।'

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

রবিন বাড়ি পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ফোন এল।

'তোর ফোন, রবিন,' মা বললেন। 'গ্রাহাম গুচ।'

রবিন ছুটে এসে ফোন ধরল।

'রবিন, আমার ধারণাই ঠিক,' ওপাশ থেকে উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল গুচ। 'আমার বার্গলার অ্যালার্মের ক্যামেরাটা নষ্ট হয়নি। আমার ভাই ছবি ডেভেলপ করার চেষ্টা করছে। ছবি হাতে পেলেই আমি তোমার বাসায় আসছি। এবার বোধহয় জানা যাবে কে প্রজেক্টটা নষ্ট করেছে!'

সাত

রবিন আর কিশোর টান টান উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিল গুচের জন্য। গুচের ফোন পেয়েই কিশোর আর মুসাকে ফোন করে রবিন। কিশোর তখুনি চলে আসে। মুসাকে বাসায় পাওয়া যায়নি। খেলতে চলে গেছে।

গুচকে সাইকেল চালিয়ে আসতে দেখা গেল। দুই গোয়েন্দা ছুটে গেল ওর কাছে।

'কোথায় ছবিটা?' রবিনের তর সইছে না। 'চেনা যাচ্ছে?'

'না,' বলল গুচ।

সাদা-কালো ঝাপসা মত এক ছবি ওর পকেট থেকে বেরোল।

'মুখ কোথায়,' ছবি দেখে হতাশ কণ্ঠে বলল রবিন। 'শুধু তো একটা হাত দেখা যাচ্ছে।'

'এতে একটা ব্যাপার স্পষ্ট হলো,' সোৎসাহে বলল কিশোর। 'অ্যালার্মটা যে ধ্বংস করেছে সে ইচ্ছা করে করেছে। দেখছ না, হাতটা এগিয়ে আসছে

http://www.murchona.com
amarboi@yahoo.com©

প্রজেক্টটা ভেঙে দিতে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় জানাল গুচ।

কিশোর খুঁটিয়ে নিরীখ করল ছবিটা।

'ছবিতে একটা জ্যাকেটের হাতা দেখা যাচ্ছে। সাদা-কালো ছবি না হলে রং দেখে অপরাধীকে খুঁজে বের করা সহজ হত।'

'হাতটা যে কোন পুরানো জ্যাকেটের হতে পারে,' বলল রবিন। 'কিন্তু কোনার দিকটা দেখো। হাতার উপরের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছে। খুব চকচকে লাগছে না কাপড়টাকে?'

'হ্যাঁ, সিল্কের মত,' বলল গুচ।

'তারমানে এটা মেয়েদের জ্যাকেট। ছেলেরা চকচকে কাপড় পরে না।' চোখজোড়া নেচে উঠল ওর। 'জুলি মরগ্যান! কালকে ওর গায়ে সিল্কি জ্যাকেট দেখেছি।'

'চকচকে গোলাপি,' বলল কিশোর। 'ছবিটা যদিও সাদা-কালো, কিন্তু জ্যাকেটটা গোলাপি বলে মনে হচ্ছে না।'

'আর ছেলেরাও সিল্কি কাপড় পরে,' বলল গুচ। 'আচ্ছা, ফুটবল জ্যাকেট নয় তো?'

'তাই তো,' বলে ছবিটা আরেকবার ভাল মত দেখল রবিন। 'আমেরিকান ফুটবল প্লেয়াররা এ ধরনের জ্যাকেট পরে।'

'স্টিভ ওকল্যান্ড রেইডার্স জ্যাকেট পরে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল কিশোর।

'ওটা সিল্কি এবং কালো।'

'ওকে ফোন করে দেখো না,' প্রস্তাব করল গুচ। 'একটা সূত্র যখন পাওয়া গেছে, ও হয়তো এখন আর অস্বীকার করতে পারবে না।'

মাথা নাড়ল কিশোর।

'বরং আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করি। ফোনে সব কথা বলা যায় না। ওর মুখ দেখেও বোঝা যাবে ও দোষী কিনা।'

'ও ছাড়া আর কে,' বলল গুচ। 'সব সূত্র তো ওর দিকেই ইঙ্গিত করে। ও বিল্ডিঙে ঢুকেছে। ও হামধুম টাইপের ছেলে। ডেভিডের উপর রাগ আছে, কালো সিল্কি জ্যাকেটও পরে। এরপর আর বাকি থাকে কী?'

'তোমার সন্দেহ করার কারণ আছে,' বলল কিশোর। 'কিন্তু আমার খারাপ লাগছে। স্টিভকে ভাল লাগে আমার। ও ভাল ছেলে।' নীচের ঠোঁটে চিমটি

কাটল। 'আচ্ছা, ডেভিডও তো ফুটবল জ্যাকেট পরে...' বলল আপন মনে। দু'জনকেই জেরা করতে হবে।

'ব্যাপারটা হয়তো নিছকই অ্যাক্সিডেন্ট,' বলল রবিন। 'ও সাহস করে স্বীকার করতে পারেনি। আমরা বললে হয়তো করবে।'

'অ্যাক্সিডেন্ট না!' ছবিটা দুলিয়ে বলল গুচ। 'অ্যাক্সিডেন্ট হলে হাতটা এভাবে ভাঙতে আসত না। আমি মানব না।'

'আর হাতটাও বিশাল,' বলল কিশোর। 'স্টিভের হাতের সাথে মেলে।' ডেভিডকেও সন্দেহ করছে বন্ধুদের বলল না।

'কালকে তা হলে ওর সাথে কথা বলছি আমরা,' বলল রবিন। 'স্কুলে দেখা হবে, গুচ। আর ছবিটা কিন্তু আনতে ভুলো না।'

সে রাতে ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। স্টিভ কি কাজটা করেছে? বিশ্বাস হতে চাইছে না ওর।

'স্টিভকে আমি দোষী ভাবতে পারছি না,' পরদিন সকালে রবিনকে বলল ও।

'আমিও না,' বলল রবিন।

'এই, দাঁড়াও,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। হন্তদন্ত হয়ে ওদের দিকে এগোচ্ছে সে। 'কী ব্যাপার বলো তো? তোমাদেরকে এরকম মন মরা দেখাচ্ছে কেন? আজকে তো অঙ্ক পরীক্ষা নেই।'

'আমরা স্টিভকে নিয়ে চিন্তিত,' বলল কিশোর। 'গুচের বার্গলার অ্যালার্ম একটা ছবি নিয়েছে।' হাতের ছবিটার কথা মুসাকে জানাল ও। জ্যাকেটের হাতাটার কথাও বলল।

'কালকে তোমাকে ফোন করেছিলাম,' বলল রবিন। 'তুমি খেলতে চলে গেছিলে। আন্টি বলেননি?'

'না তো,' বলল মুসা। 'বোধহয় ভুলে গেছে। যাকগে, কিন্তু কিশোরের বর্ণনা শুনে তো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সিরিয়াস। স্টিভ ওকল্যান্ড রেইডার্স জ্যাকেট পরে। ওটা সিল্কি আর কালো।'

রবিন মাথা ঝাঁকাল।

'মনে হচ্ছে কাজটা ওরই।'

'স্রেফ ধারণা। এখনই শিয়োর বলা যাচ্ছে না,' বলল কিশোর।

'ধুর, মনটা খারাপ হয়ে গেল,' মুসা বলল। 'স্টিভের সাথে আমার ভাল দোস্তী হয়ে গেছিল।'

'নাচো চীয চিপস ওরও পছন্দ, দোস্তী তো হবেই,' হালকা গলায় বলল কিশোর।

'রুডি আর ডেভিড প্রথম দিন থেকেই ওর পিছে লেগেছে,' বলল রবিন। 'আর এখন তো সবাই ওকে ছি ছি করবে। ওকে স্কুল থেকে এক্সপেল করে দেয় কিনা কে জানে।'

'সত্যিই যদি প্রজেক্ট দুটো ও ভেঙে দিয়ে থাকে,' বলল মুসা, 'তবে খুবই নিচু মনের পরিচয় দিয়েছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কিশোর।

'আগে ওর সাথে কথা বলে দেখি, তারপর সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। এখনও ওর দোষ প্রমাণিত হয়নি।'

গুচ ওদের জন্য স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে ছিল।

'স্টিভ এখনও আসেনি,' জানাল। 'আমি ছবিটা নিয়ে এসেছি।'

'চলো দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াই,' প্রস্তাব করল কিশোর। 'সবার সামনে জেরা করে ওকে অপদস্থ করতে চাই না।'

একপাশে সরে এসে দাঁড়াল ওরা। একটু পরে জুলি মরগ্যান তার বান্ধবীদের সঙ্গে এসে পৌঁছল। জুলির পরনে সিল্কি গোলাপি জ্যাকেট, কিন্তু হাতার কাছে নকল ফার লাগানো।

অবশেষে গেট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল স্টিভ।

'হাই,' হাঁক ছেড়ে হাত নাড়ল ওদের উদ্দেশে। হাসি-খুশি, নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে ওকে।

কিশোর বুক ভরে শ্বাস টানল।

'স্টিভ, এদিকে একবার আসবে?'

এগিয়ে এল স্টিভ।

'অ্যাই, মুসা, মা আজকে নতুন ব্র্যান্ডের চিপস দিয়েছেন। টেস্ট করে দেখবে নাকি?'

'এখন না, স্টিভ,' বলল মুসা।

স্টিভ তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'সায়েন্স প্রজেক্ট দুটো কে ভেঙেছে সম্ভবত জেনে গেছি আমরা,' বলল মুসা।

'তাই নাকি? সাবাস!' বলে উঠল স্টিভ। 'কে?'

'তুমি, স্টিভ,' গোমড়া মুখে বলল মুসা। 'বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু উপায় নেই। তুমি চাইলে তোমার জন্য প্রিন্সিপালের কাছে যেতে পারি আমরা।'

রাগে লাল হয়ে গেল স্টিভের মুখের চেহারা।

'কতবার বলব আমি কাজটা করিনি!' ফেটে পড়ল ও। 'আমি অডিটোরিয়ামের ধারে-কাছেও যাইনি। কসম খেয়ে বলতে পারি। কী বললে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে জানতে পারি?'

'এই ছবিটার কী ব্যাখ্যা?' মুসা ফটোটা এগিয়ে দিয়ে বলল।

'তুমি একমাত্র কালো চকচকে জ্যাকেট পরো,' বলল গুচ।

'অবশ্য এটা সাদা-কালো ছবি,' বলল কিশোর। 'জ্যাকেটটা গাঢ় যে কোন রঙের হতে পারে। কালোই হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অনেকেই তো ওর মত ফুটবল জ্যাকেট পরে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল মুসা। 'ফুটবল জ্যাকেট পরে কালকে আরেকজন ঢুকেছিল অডিটোরিয়ামে।'

'ডেভিড,' বলল রবিন। 'কিন্তু ও নিজের প্রজেক্ট নিজে ভাঙতে যাবে কেন?'

'খটকাটাই তো সেখানে,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল কিশোর। 'ওকেও জেরা করতে হবে।'

'তার আগে এক কাজ করা যাক,' প্রস্তাব করল মুসা। 'গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। দেখি থার্ড আর ফোর্থ গ্রেডারদের মধ্যে কে কে আজকে ডার্ক কালারের চকচকে জ্যাকেট পরে এসেছে।'

'থার্ড গ্রেডের কেউ ফুটবল জ্যাকেট পরে না,' জানাল গুচ।

'এটা সাধারণত বড় ছেলেরা পরে,' বলল রবিন।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছেলে-মেয়েদেরকে ঢুকতে দেখল ওরা।

বেল বাজার ঠিক আগ মুহূর্তে সদলবলে হাজির হলো রুডি মার্শ। স্টিভকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা।

'আরে, ভূমিকম্প ভায়া যে! আজকে আবার কোন বিজ্ঞান মেলায় তাণ্ডব

চালাচ্ছ শুনি?' রুডি জিজ্ঞেস করল।

'ভূমিকম্প আমার মস্ত ক্ষতি করেছে,' গর্জে উঠল ডেভিড। 'আমি ফার্স্ট প্রাইযটা জিততে পারতাম।'

'আমি কিছু করিনি!' বলতে শুরু করল স্টিভ। 'হাজারবার বলেছি–'

ও যখন কথা বলছে, রবিনের পাঁজরে কনুইয়ের আলতো গুঁতো দিল কিশোর।

ডেভিডের গায়ে আজও ডার্ক ব্লু নিউ ইয়র্ক জায়ান্টস জ্যাকেট।

আট

রবিন চেয়ে রইল ডেভিডের দিকে। তারপর দৃষ্টি ফেরাল কিশোরের উদ্দেশে। মাথা নাড়ল।

'নাহ, ও হয়তো প্রাইযটা জিতেই জেত। নিজের প্রজেক্ট ভেঙে লাভটা হলো কী?'

'কিন্তু মনে রেখো, ওর প্রজেক্টে শুধুমাত্র ওরই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে,' বলল কিশোর। 'এবং জুলি মরগ্যানের পিছন পিছন বিল্ডিঙে ঢুকেছিল ও।'

'ঠিক,' গলা মেলাল মুসা। 'আমি ওকে ঢুকতে দেখেছি। হট-ডগ খাওয়ার পর।'

কিশোর এক পা আগে বাড়ল।

'জাস্ট আ মিনিট, ডেভিড। অন্যকে তো খুব দোষ দিচ্ছ, কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও দেখি।'

তীব্র তাচ্ছিল্য ছড়িয়ে পড়ল ডেভিডের চেহারায়।

'গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে, না?' খেঁকিয়ে উঠল। 'কিশোর পাশা, চাচা ডিটেকটিভ হলে ভাতিজাও ডিটেকটিভ হয়ে যায় না। কী ক্লু আছে তোমার কাছে, আমাকে জেরা করতে চাও?'

'অনেকগুলো আছে,' ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল কিশোর। 'তার মধ্যে এটা একটা।'

ছবিটা তুলে ধরল, ডেভিড যাতে দেখতে পায়।

'কী এটা?' ডেভিডের গলায় সন্দেহ।

'মনে আছে নিশ্চয়ই, তুমি শুচকে বলেছিলে ওর বার্গলার অ্যালার্ম কাজ করবে না? করেছে কিন্তু। প্রজেক্টটা যে ধ্বংস করেছে তার ছবি তুলে নিয়েছে ওটা। শুচ কাল ডেভেলপ করেছে ছবিটা।'

'দেখি!' বলে থাবা মারবার চেষ্টা করল ডেভিড। কিন্তু কিশোর চোখের পলকে সরিয়ে ফেলল ওটা। 'তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না!' চিৎকার ছাড়ল ডেভিড।

'ও, তাই বুঝি? প্রজেক্টটা ভাঙতে একজন কালো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা কোন প্রমাণ নয়?' কিশোর কঠোর কণ্ঠে বলে উঠল। 'অথচ তার গায়ে তোমার জ্যাকেটটা শোভা পাচ্ছে! জানো নিশ্চয়ই, তোমার প্রজেক্টে তোমার একারই ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে, আর কারও নয়। কেউ ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে তেমন কোন আলামতও পাওয়া যায়নি। এর অর্থ, তুমি ছাড়া আর কেউ ওটা ছোঁয়নি!' এসব কথা বলে ভড়কে দিতে চাইছে ও ডেভিডকে।

ডেভিডের মুখের চেহারা কাগজের মত সাদা দেখাচ্ছে। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে।

'ডেভিড, কাজটা তুমি করেছ?' রুডি প্রশ্ন করল।

'তুমি কি চাও তোমার দোষে অন্য কেউ শাস্তি পাক?' যোগ করল রবিন।

'না, চাই না,' বলে উঠল ডেভিড। 'কাজটা আমারই। সাইসমোগ্রাফের চমৎকার এক ডায়াগ্রাম দেখি বিজ্ঞানের এক বইতে। খুবই জটিল জিনিস। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম বাবা-মা বুঝি ওটা তৈরি করতে আমাকে সাহায্য করবে। তারা দু'জনেই সায়েন্টিস্ট জানোই তো। তাদের জন্য কাজটা পানির মত সহজ।'

পায়ের কাছে চোখ নামাল ডেভিড। মাটিতে লাথি মারল।

'কিন্তু তাদেরকে বলতে তারা বলল নিজে বানিয়ে নাও। তা না হলে নাকি শিখতে পারব না।

'আমার বোঝা উচিত ছিল সাহায্য পাব না। আমার বাবা-মা ওরকমই। তাই আমি বাধ্য হয়ে কয়েকটা টুকরো জোড়া লাগাই। জিনিসটা দেখতে যাতে ছবির প্রজেক্টটার মত হয়। কিন্তু আসলে তো কোন কাজের না।' এ পর্যন্ত এসে চুপ করে গেল ডেভিড।

'থামলে কেন, বলো!' রুডি চাপ দিল। 'নিজের প্রজেক্ট ভাঙতে গেলে কেন?'

লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না ডেভিড। জবান বন্ধ।

গোটা ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে কিশোরের কাছে।

'আমি বলছি,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ও ভাবতে পারেনি জাজদের সামনে ডেমনস্ট্রেট করতে হবে। যখন টের পেল জাজরা ধরে ফেলবেন জিনিসটা ভুয়া, তখন গোপনে অডিটোরিয়ামে ঢুকে ভেঙে দিয়ে এল।'

'কিন্তু তাই বলে গুচেরটা ভাঙবে কেন?' মুসা জবাব চাইল। 'ওর কী দোষ?'

'ও ভেবেছিল,' বলল কিশোর, 'দায়টা স্টিভের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে। সবাই জানে স্টিভের হাত-পা একটু বেশি চলে। তুমি আবার কিছু মনে কোরো না, স্টিভ।'

'না, না, তুমি বলো,' হাসি মুখে অনুমতি দিল স্টিভ।

'তা ছাড়া স্টিভকে ও শুরু থেকেই জ্বালাতন করছিল,' কথার সুতো ধরল গোয়েন্দাপ্রধান। 'তাতেও স্টিভের ওপর সন্দেহ পড়ে। আর নিজেরটাসহ দুটো প্রজেক্ট ভেঙে দিলে সহজেই দোষটা স্টিভের ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়। সবাইকে বোঝানো যাবে স্টিভের ধাক্কা লেগে প্রজেক্ট দুটো টেবিল থেকে পড়ে গেছে।

'আর তাই সুন্দর এক প্ল্যান ছকে ফেলে ও,' বলে চলেছে কিশোর। 'ছোট একটা ছেলেকে দিয়ে স্টিভকে বলায়, ওকে অফিসে ডেকেছে। সবাই স্টিভকে বিল্ডিঙে ঢুকতে দেখে। আর ও নিজেও জুলির পিছু পিছু ঢুকে পড়ে ভেতরে। এখানেই শেষ না, জুলিকেও ফাঁসানোর চেষ্টা করে ও। জিনার পুতুলের জুতোটা টানাটানি করতে গিয়ে ওর হাতে চলে আসে, সেটা ও ফেলে আসে অডিটোরিয়ামে। কিন্তু গোল বাধায় তিন নম্বর চোখ, অর্থাৎ গুচের বার্গলার অ্যালার্মের ক্যামেরাটা। ও ভাবতেও পারেনি ওটা ছবি তুলে নেবে। কী, ঠিক বলছি তো, ডেভিড?'

মাথা ঝাঁকাল ডেভিড।

'আমাকে মাফ করে দাও, গুচ,' বলল কাতর কণ্ঠে। 'আমি তোমার মস্ত ক্ষতি করেছি। তোমার প্রজেক্টটা সত্যিই তুলনাহীন। ওটা নির্ঘাত প্রথম পুরস্কার পেত। কোনভাবে কি ওটা মেরামত করা যায় না?'

মাথা নাড়ল গুচ।

'না, তবে অফারটার জন্য ধন্যবাদ। আমার জিনিসটা যে ঠিকমত কাজ করেছে তাতেই আমি খুশি।'

'গুচ ভবিষ্যতে মস্ত বড় সায়েন্টিস্ট হবে,' গর্ব ভরে বলল রবিন। 'আমি জাজদেরকে বলব ওর অ্যালার্মটা চমৎকার কাজ করেছে। ওকে যেন পুরস্কার দেয়া হয়।'

একটু পরে রবিন আর গুচ স্কুলের ভিতরে প্রবেশ করল।

কিশোর তাকাল ডেভিডের দিকে।

'প্রিন্সিপালকে সব কথা জানাচ্ছ তো?'

'মিসেস মোরেলকে আগে জানাই,' বলল ডেভিড। 'প্রিন্সিপাল যা কড়া!' স্টিভের কাছে এসে ওর কাঁধ জড়িয়ে ধরল ও। 'আমি দুঃখিত, স্টিভ। পারলে মাফ করে দিয়ো।'

সেদিন বিকেলে থার্ড ও ফোর্থ গ্রেডাররা যার যার প্রজেক্টের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করল বিচারকদের সামনে। পরদিন সকালে মিসেস মোরেল তাঁর ক্লাস নিয়ে অডিটোরিয়ামে ফিরে এলেন।

কিশোর, রবিন আর মুসার প্রজেক্টের গায়ে রিবন লাগানো। শুভেচ্ছা পুরস্কার জিতেছে তিন জনেই।

তিন বন্ধু পরস্পরের তালু চাপড়ে হাই ফাইভ বিনিময় করল।

হাসি মুখে গুচের ভাঙা প্রজেক্টের পাশ কাটাল ওরা।

'আরি!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। নীল রিবন লাগানো রয়েছে গুচের অ্যালার্মের গায়ে। প্রথম পুরস্কার।

মিসেস মোরেল ওদের পিছনে এসে দাঁড়ালেন।

'অ্যালার্মটা কীভাবে কাজ করে আমাদেরকে বুঝিয়ে বলেছে গুচ। দারুণ একটা জিনিস বানিয়েছে ও-মোস্ট অরিজিনাল।...ডেভিড আমাকে সবই বলেছে, কিশোর। মাফ চেয়েছে। প্রিন্সিপালকে আমি বুঝিয়ে বলব। আশা করি উনি ডেভিডকে ক্ষমা করে দেবেন।...তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, কিশোর। তোমরা রহস্যটার সমাধান করায় পুরো ব্যাপারটা ভালয় ভালয় শেষ হলো। আবারও তোমরা বাজিমাত করলে।'

লাজুক হাসল কিশোর। 'থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাডাম,' বলল।

মিসেস মোরেল চলে গেলেন।

হঠাৎই মেয়ে কণ্ঠের এক চিৎকার কানে এল ওদের।

'আরে, দারুণ তো! সাবাস, স্টিভ, হেভী দেখিয়েছ!'

স্টিভের প্রজেক্টের সামনে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিল তিন গোয়েন্দা। গতকাল এটাকে স্রেফ এক গ্লাস পানি মনে হয়েছিল, তার ঝুলছে যেটার ভিতরে। আজ দেখা গেল ঝকমকে ক্রিস্টাল জমাট বাঁধছে তারের উপরে-নীচে।

'তুমি সত্যি সত্যি ক্যান্ডি বানিয়ে ফেলেছ!' কিশোরের কণ্ঠে বিস্ময়।

'করলে কীভাবে?' জুলি জিজ্ঞেস করল। 'ছিল তো শুধু এক গ্লাস পানি।'

'পানির ভেতর তো চিনিও ছিল প্রচুর পরিমাণে,' বলল স্টিভ। 'এক কাপ ফুটন্ত পানিতে এক কাপের বেশি চিনি ঢালতে হবে। সব চিনি গলে যাওয়ার পর মিক্সচারটা ঠাণ্ডা হলে, একটা গ্লাসে ঢেলে নেবে। তারপর একটা তার ঝুলিয়ে দিলে দেখবে তারটাকে ঘিরে চিনির ক্রিস্টাল তৈরি হচ্ছে।'

'আমি দেখব তো করে,' সোৎসাহে বলল জুলি।

'আমিও,' বলে উঠল মুসা। 'খাইছে! নিজের বাসায় ক্যান্ডি ফ্যাক্টরি, আমাকে আর পায় কে? স্টিভের তুলনা নেই!'

'কিশোর, মুসা, রবিন, তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ,' হড়বড় করে বলল স্টিভ। 'দুঃসময়ে আমার পাশে থাকার জন্য।'

তিন গোয়েন্দা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। মুখে হাসি ওদের।

'আমরা তোমার পাশেই থাকব, স্টিভ।-ওহ, এমন বন্ধু কোথায় পাব-বললেই ঝটপট ক্যান্ডি বানিয়ে দিতে পারে!' সোল্লাসে বলে উঠল মুসা।

***

কালো পিশাচ

শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রথম প্রকাশ: ২০০৫

এক

স্পুকভিলে আলফ্রেড চাচার বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি আমি, কিশোর আর মুসা। শহরটা রকি বীচ থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। আমার বাবা-মা যাচ্ছেন আয়ারল্যান্ডে। তাই আমাকে যেতে হচ্ছে ওখানে। কিন্তু চাচাতো ভাই ববের কথা ভাবলেই চাচার বাসায় বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেটা শিকেয় ওঠে। কারণ বব সুযোগ পেলেই আমার পিছনে লাগে। এটাই ওর স্বভাব। আমাকে জ্বালাতন করে মজা পায়। এমনকি আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেও আমার নিস্তার নেই। ঠিক পিছে লেগে থাকবে। চাচা-চাচীর সামনে অবশ্য আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তখন একেবারে সুবোধ বালক। আমিও তাঁদেরকে নালিশ করতে যাই না। যতটা পারি মুখ বুজে সহ্য করে নিই। সেজন্যই হয়তো ববের ঝড়-ঝাপটা একটু কমই যায় আমার উপর দিয়ে। ও কিন্তু মুসাকে খুব ভয় পায়। মুসা কাছে পিঠে থাকলে আমার সঙ্গে লাগতে আসে না।

ফিফথ গ্রেডের পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি, হাতে অফুরন্ত সময়। বাবা-মাও দেশে থাকছেন না। অগত্যা যেতেই হচ্ছে আমাকে স্পুকভিলে। তবে ভরসা একটাই, সঙ্গে থাকছে আমার দুই বন্ধু কিশোর আর মুসা।

বব ঘুমাচ্ছে দেখে টিভি গেমটা নিয়ে বসেছিলাম। 'অনেক হয়েছে, রবিন,' হঠাৎই বলে উঠল ও। 'এবার ভাগো। আমি খেলা দেখব।' টিভির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ও। ঘুম থেকে উঠে আসায় খাড়া হয়ে রয়েছে কালো চুল, আর প্যান্টের সামনের দিকে লেগে আছে আঙুরের রসের দাগ।

টিভি গেম খেলা মাথায় উঠল আমার।

বাঁকা হাসি ফুটিয়ে তুলল বব ঠোঁটের কোণে।

'তুমি না বিজ্ঞান মেলায় নাম লিখিয়েছ?' বলল। 'যাও না, তোমার পচা প্রজেক্টটা নিয়ে মাথা ঘামাওগে না। খামোকা টিভিটা দখল করে রেখেছ

http://www.murchona.com aimsumon@yahoo.com

কেন?' স্পুকভিল স্কুলে বিজ্ঞান মেলা হবে। চোদ্দ বছরের নীচে যে কেউ তাতে অংশ নিতে পারবে। চাচা আমাকে নিয়ে গিয়ে নাম লিখিয়ে এনেছেন। এখানে থাকতে হবে বেশ কিছু দিন। তাই আমিও খুশি মনে রাজি হয়ে গেছি। গেমটা শেষ করেই চলে যাচ্ছি, বলে ঘাড় কাত করে টিভির দিকে চাইলাম। এখনও হয়তো হাই স্কোর করার কোন সুযোগ থাকতে পারে এই আশায়।

বব উবু হয়ে বসলে বাটন দাবালাম আমি। নাহ্, আমার লোকটাকে বাঁচানো গেল না। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ববের, সিধে হয়ে দাঁড়াল। টিভির রিমোট কন্ট্রোলটা আঙুল ইশারায় চাইল।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম। আমাকে ওভাবে চাইতে দেখে হেসে উঠল বব। এই কাজটা খুব ভাল পারে ও। ববের ভিলেন মার্কা হাসিটা বুক কাঁপিয়ে দেবে বয়সে ছোট যে কারও। খেলা ভুলে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

লাল পাওয়ার বাটনটা টিপে দিল বব। টিভি স্ক্রীনের সব রং মুছে গেল নিমেষে।

'অনেক হয়েছে।' গাঁক-গাঁক করে বলল। দু'বাহু ভাঁজ করে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে ও।

দ্রুত লয়ে ওঠা-নামা করছে আমার বুক। ও এত নীচ কেন? আমাকে দশটা মিনিট সময় দিলে কী এমন ক্ষতি হয়ে যেত? হাজার হলেও আমি তো ওদের অতিথি। অবশ্য ববকে এসব কথা বলে কোন লাভ নেই। ও এরকমই।

মুচকি হাসল বব। হাসল মানে মুখের দুটো কোণ একটু নড়ে উঠল আরকি। চোখ সরু করে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। ভঙ্গিটা এমন যেন আমি একটা ছারপোকা। মন চাইলেই পিষে দিতে পারে জুতোর তলায়।

'আমার কথাই এখানে আইন, বোঝা গেছে, বাঁটকু কোথাকার!' আমার কাঁধে ধাক্কা দিল ও।

সত্যি বলতে কি, বয়সের তুলনায় অনেক বড় দেখায় ওকে। আমাকে জ্বালাতন করাটা ওকে মানায় না। হঠাৎই রাগ উঠে গেল আমার। নিজেকে কোণঠাসা বেড়ালের মত লাগছে। আর নয়। অনেক সহ্য করেছি। খেলতে তো দিলই না আবার বাঁটকু বলে অপমান করছে।

কেন যে করে বসলাম কাজটা জানি না। ভুলে গেলাম ও আমার চাইতে তিন বছরের বড় এবং অনেক বেশি শক্তিশালী।

ঘুসি মারলাম ববকে।

খুব জোরে নয়। কিন্তু লেগেছে ওকে। 'উহ' করে উঠল।

কী করেছি উপলব্ধি করতেই ঢোক গিলবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।

এখন বাঁচার উপায় একটাই।

'তবে রে, বাঁটকুল…' আমাকে ধরার জন্য থাবা মারল বব। মারাদোনার মত বডি ডজ দিয়ে ছিটকে সরে গেলাম। তারপর হলঘরের দিকে ঝেড়ে দিলাম দৌড়। উদ্দেশ্য, কিচেনের দরজা দিয়ে পালাব। কিশোর আর মুসাও বাসায় নেই যে ওদেরকে ডাকব। ওরা গেছে শহর দেখতে।

'দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা!' আমার পিছু তাড়া করছে বব। কাঠের মেঝেতে তুমুল শব্দ উঠেছে। এবাড়িটা এমনিতেই বিরাট বড়। এখন আরও বড় লাগছে। পিছনের দরজাটা আর কত দূর? যে করে হোক বাইরে বেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। ভিতরে ধরা পড়লে আমার যে কী দশা হবে কেউ জানতেও পারবে না।

পিছন দিকে চকিতে একবার চেয়েই সাঁত করে মাথা নোয়ালাম। আমার উদ্দেশে ঝাঁপ দিল বব। কিন্তু কার্পেটে পা বেধে মেঝেতে পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। আরেকটু হলেই হেসে ফেলেছিলাম। কোনমতে সামলে নিয়ে টলমল পায়ে ছুটলাম কিচেনের দিকে।

'পালাবি কোথায়!' চেঁচিয়ে উঠল বব। সটান উঠে দাঁড়িয়ে কার্পেটটা ঠিকঠাক করল। তারপর আবার শুরু করল ধাওয়া।

ইতোমধ্যে কিচেনে ঢুকে পড়েছি আমি। পিছনের দরজাটা লাগিয়ে দিলাম সশব্দে। ঝন-ঝন করে উঠল ঝুলিয়ে রাখা কাপ-পট। ইয়ার্ডে এক পলকে নজর বুলিয়ে নিলাম। সামনে দুটো মাত্র রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু হাতে একদম সময় নেই। যা করার এখুনি করে ফেলতে হবে।

দড়াম করে পিছনে বন্ধ হলো কিচেনের দরজা। চমকে উঠলাম আমি। ফেন্স টপকে পালাব সে সময় নেই। গেট পর্যন্ত পৌঁছনোও এমুহূর্তে অসম্ভব। কিন্তু ট্রী হাউসটা… প্রকাণ্ড ওকটার কাছে হয়তো পৌঁছতে পারব। প্রাণপণে ছুট দিলাম, পিছনে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে ববের ছুটন্ত পদশব্দ। ও ভারী শরীর

নিয়ে দৌড়ে ধরতে পারবে না আমাকে।

হাপরের মত হাঁপাচ্ছি। ওক গাছটার উদ্দেশে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড় লাগালাম। বসার জন্য কয়েকটা তক্তা দিয়ে একটা আসন মত করা হয়েছে গাছে। শুনেছি, চাচা যখন বাড়িটা কেনেন তখন থেকেই আছে এটা। ববের সাধ্য হবে না ওখানে আমার নাগাল পায়। এই একটা জিনিসকেই ভয় পায় বব। ওর দুর্বলতাটা জানি আমি–উচ্চতা। সেদিন টিভি অ্যান্টেনা ঠিক করতে চাচা ছাদে পাঠিয়েছিলেন। সে কী কাঁপাকাঁপি ওর! মুখের চেহারা দেখাচ্ছিল মড়ার মত।

ওক গাছ থেকে রশি ঝুলছে। ওটা বেয়ে তরতর করে উঠে গেলাম। আমি উপরে উঠেছি কি উঠিনি, রশির শেষ প্রান্ত চেপে ধরল বব। ওটা ধরে এপাশ-ওপাশ দুলাচ্ছে। ফেলে দিতে চাইছে আমাকে। অবস্থা বেগতিক দেখে একটা পা চাপিয়ে দিলাম তক্তার উপর। কিন্তু বিধি বাম। বব রশি দুলিয়ে আমাকে তক্তাছাড়া করল। এমুহূর্তে স্রেফ দড়ি ধরে ঝুলে রয়েছি আমি।

'তোমাকে খুন করে ফেলব!' বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল বব। কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না আমি, এমনই মুখ-চোখের ভঙ্গি ওর।

এতটাই ঘামছি, হাত পিছলে যাচ্ছে দড়িতে। পায়ের পাতা বাড়িয়ে কোনমতে গোড়ালি ঠেকালাম কাঠের তক্তার উপর। তারপর এক পায়ের উপর ভর করে, শরীরটা টেনে তুললাম খটখটে, এবড়োখেবড়ো তক্তার আসনে। এবার ছেড়ে দিলাম দড়িটা। বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলাম দস্তুরমত। ববের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

'পারলে ধরো,' শ্বাসের ফাঁকে চেঁচালাম। বুড়ো আঙুলও দেখিয়ে দিলাম ওকে।

টকটকে লাল হয়ে গেছে ববের মুখের চেহারা। চোখ সরু করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কোমরে হাত রেখে অন্য দিকে দৃষ্টি মেলে দিল। ফিরে যখন চাইল, ঠোঁটে হাসি ওর। আমাকে ধরতে আসবে নাকি? প্রমাদ গুণলাম। কিন্তু ও স্থির দাঁড়িয়ে রইল নীচে, মুখে লেপ্টে রয়েছে হাসিটা। ভাবখানা এমন, যেন ও এমন কিছু জানে যেটা আমি টের পাচ্ছি না।

'বেশ তো, বাইরে থাকতে চাও কে মানা করেছে!' দাঁত বের করে হাসল ও। একটু পরে ঘুরে দাঁড়িয়ে গটগট করে ইয়ার্ড পেরিয়ে গেল।

ট্রী হাউসে বসে ওকে চলে যেতে দেখলাম। চাচা-চাচী ফেরা না পর্যন্ত নীচে নামছি না কিছুতেই।

বব পিছনের দরজাটা লাগিয়ে দিল। পরমুহূর্তে আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের রেখা। বাজ পড়ল কানে তালা লাগিয়ে।

গুটিসুটি মেরে গাছে বসে রইলাম। নিজের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

এখানে বসে কী করব আমি? চাচার মুখে শুনেছি এ শহরে নাকি প্রায়ই ঝড়-তুফান হয়। ঝড়ের সময় গাছের নীচে দাঁড়াতে নেই, বিজলী আঘাত হানতে পারে। আর আমি তো উঠে বসে আছি গাছে! যদি বাজ পড়ে?

সেই সকাল থেকেই মেঘ জমছে। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি নামবে বুঝি যে কোন মুহূর্তে।

আকাশের দিকে চেয়ে নাক চুলকালাম। যত যাই হোক, ঝড় আসেনি এখনও। ভিতরে গিয়ে ববের হাতে মার খাওয়ার চাইতে বরং এখানে বসে থাকাও ভাল।

আশপাশে কাউকে চোখে পড়ছে না। সবাই যেন ঝড়-বৃষ্টির কবল থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছে বাড়িতে।

তক্তার উপর ঘুরে বসলাম। সমতল মাঠ পেরিয়ে দৃষ্টি চলে গেল সবচাইতে কাছের বাড়িটার দিকে।

ট্রী হাউসে বসে আশপাশের গাছ-পালা, মাঠ, ফাঁকা জমি সব কিছু পরিষ্কার নজরে পড়ছে। ওক গাছটা বছরের এসময়টায় প্রায় ন্যাড়া হয়ে এসেছে। কাজেই দৃষ্টি মোটেই বাধা পাচ্ছে না।

আকাশ কালো হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। রাত ঘনাচ্ছে যেন। হলদেটে বাতি জ্বলছে মি. পাইকের বাড়িতে। তবে মনে হচ্ছে বহু দূরে কোথাও বুঝি। মি.পাইক চাচার ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকেন। চাচার বাড়ির ডান দিকে স্কুল। এশহরে ওই স্কুলটাই শেষ সীমানা। তারপর আর কোন ঘর-বাড়ি নেই।

ট্রী হাউসে বসে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছি মি. পাইকের বাড়ির উদ্দেশে। একবার ভাবলাম তাঁর ওখানেই চলে যাব কিনা। কিন্তু মন স্থির করতে পারলাম না। নীচে নামলেই বব পাকড়াও করে যদি?

তাকিয়ে আছি, দেখতে পেলাম একে একে নিভে যাচ্ছে মি.পাইকের

বাসার সব আলো। অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিভল বাতিগুলো। প্রথমে ম্লান হয়ে এল ধীরে-ধীরে, তারপর নিভে গেল পুরোপুরি। ভদ্রলোক হয়তো বাইরে যাবেন। তারমানে ওঁর কাছে যাওয়া হচ্ছে না। নিরাপদ কোন আশ্রয়ে চলে যেতে আকুলিবিকুলি করছে প্রাণটা।

হঠাৎ চাবুক হানল বাতাস। ডাল-পালা খটখটিয়ে দুলে উঠল। গালে খোঁচা খেলাম ডালের। বুকের কাছে হাঁটু জড় করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছি। ববের তাড়া খেয়ে ঘাম ছুটে গিয়েছিল, এখন ঠাণ্ডা লাগছে। চাচা-চাচী, কিংবা কিশোর-মুসা সন্ধ্যা উতরালেই চলে আসবে, সান্ত্বনা দিলাম নিজেকে। ততক্ষণ আর একটু কষ্ট করো, রবিন।

মিনিট পাঁচেক পর মনে হলো একটা কোট পেলে ভাল হত। কিংবা সোয়েটার। গরম কাপড় যা হোক একটা কিছু।

আমাকে এভাবে ঠাণ্ডায় কষ্ট দিয়েছে জানলে চাচা-চাচী নিশ্চয়ই বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করবেন না ববকে। উহু, কখন আসবেন ওঁরা? কিশোর, মুসা, কোথায় তোমরা?

টপ করে হিমশীতল এক ফোঁটা পানি পড়ল নাকের ডগায়। মুখ তুলে চাইলাম।

কুৎসিত রকমের কালো দেখাচ্ছে আকাশটাকে। ভারী মেঘ জমাট বাঁধছে ক্রমেই। এই বুঝি ভূতের মত নিঃশব্দে পিছনে এসে দাঁড়াবে কেউ। দুরুদুরু বুকে তক্তার উপর নড়েচড়ে বসলাম। পিঠ ব্যথা করছে। গুড়-গুড় শব্দ। পরক্ষণে গায়ের চামড়ায় হুল ফুটল যেন।

বিদ্যুৎ। স্থির বিদ্যুৎ।

বাতাসে স্বল্পাণু ভাসে। স্বল্পাণুগুলো লাফালাফি করার ফলে শক্তি সঞ্চয় হয়। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম, কার্পেটে দু'পা ঘষে তুমি কাউকে স্পর্শ করলে শরীরে যেমন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ বয়ে যায় তেমনি আরকি।

আরেকটা গুড়-গুড় শব্দ কাঁপিয়ে দিল গাছসহ আমাকে। চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে দেখে নিলাম বিজলী চমকাচ্ছে কিনা। যেই ঘুরে বসেছি, বাতাসে অদ্ভুত এক শব্দ পেলাম।

নিচু, নিঃশব্দ গুঞ্জনের মত শব্দ।

কুয়াশা ভেসে রয়েছে বাতাসে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে। ঠাণ্ডা বেড়েছে আরও। বৃষ্টি পড়ছে না বটে, তবে শুরু হতে কতক্ষণ?

বহু দূর থেকে আবারও বাজের গুরু গম্ভীর আওয়াজ কানে এল। কিন্তু গুঞ্জনের শব্দটা এল খুব কাছ থেকে।

গাছ থেকে নেমে এসে, ইয়ার্ডে পা টিপে টিপে হাঁটাহাঁটি করতে লাগলাম। শব্দটার উৎস খুঁজছি। হাঁটছি বলে শীত কম লাগছে।

বাড়ির দিকে এগোলে গুঞ্জনধ্বনিটা থেমে যাচ্ছে। কাজেই রাস্তার দিকের দেয়ালের উদ্দেশে পা বাড়ালাম।

জোর বাতাস বইছে। শব্দটা ভাল করে শুনবার জন্য কান পেতে আছি। গাছের ডালে খটাখট আওয়াজ তুলছে বাতাস। আমার কানের পাশ কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ শব্দ করে। গুঞ্জনধ্বনিটা কিন্তু থেমে নেই। ক্রমাগত হয়েই চলেছে।

হঠাৎই নাক কুঁচকে গেল। রাস্তার যত কাছে এগোচ্ছি অচেনা গন্ধটা ততই তীব্র হচ্ছে। হেয়ার ড্রায়ার অনেকক্ষণ অন করে রাখলে যেমন গন্ধ বেরোয় এটাও অনেকটা তেমনি।

শব্দটা অনেক বেশি জোরদার এখানে। কীসে শব্দ করছে দেখতে হচ্ছে।

গুঞ্জনধ্বনিটা এবার কড় কড় শব্দে রূপ নিল। মনে হচ্ছে হাতের মুঠোয় কেউ বুঝি প্লাস্টিক মুচড়াচ্ছে। কড় কড়, ভন-ভন এসব হচ্ছেটা কী?

চোখ বুজে, মাথা কাত করে মন দিয়ে শুনছি। একটু পরে চোখ মেলে উপর দিকে চাইলাম।

এশহরের সবকটা পাওয়ার লাইন নেমে এসেছে মি. পাইকের বাড়ির ঠিক উপরের পাহাড়সারি থেকে। হাই পাওয়ার লাইন– একেকটা মস্ত বড় সিলভার টাওয়ারে যুক্ত হয়েছে লাইনগুলো। তিনটে বাড়িকে একটার উপর একটা রাখলে যত খানি লম্বা হবে ঠিক সে সমান প্রতিটা টাওয়ার। পাহাড় থেকে নেমেছে কালো রঙের প্রকাণ্ড ছটা কেব্‌ল্। পাওয়ার সাপ্লাই করছে স্পুকভিল শহরে। মি. পাইকের বাসার একটু দূরে, গতি পথ পরিবর্তন করেছে পাওয়ার লাইনগুলো। সিলভার টাওয়ার থেকে কাঠের তৈরি বাদামি পোলে সংযোগ পেয়েছে।

চাচার বাসার পাশ দিয়ে যে লাইনটা গেছে সেটার দিকে চোখ তুলে তাকালাম। সাইডওয়কের অনেক উপরে, মোটা মোটা থাম থেকে ঝুলছে তারগুলো। ভন-ভন শব্দটা আসছে ওখান থেকেই। পাওয়ার লাইন ভিজেছে তো, তাই শব্দ করছে আরকি।

হঠাৎই স্পার্ক করল পাওয়ার লাইন। আরে, এত শক্তিশালী, মোটা তার আবার স্পার্ক করে নাকি? ব্যাপারটা কী?

গুঞ্জনধ্বনি আরও বেড়েছে। পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম। পাওয়ার লাইনের নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম ঘটনা কী। পুলিস কিংবা দমকলে কি খবর দেওয়া উচিত?

বাতাসের দোলায় দুলছে তারগুলো। রীতিমত জীবন্ত দেখাচ্ছে। শব্দটা এখন আরও জোরাল। মনে হচ্ছে হঠাৎই যেন ফুলে উঠেছে তারগুলো। ক্ষমতার চাইতে যেন এমুহূর্তে অনেক গুণ বেশি বিদ্যুৎচালিত করছে।

বাতাসের শাসানি থেমেছে। কিন্তু পোলের সবচেয়ে নীচের তারটা বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দুলছে, লাফাচ্ছে।

সারা শরীর হিম হয়ে আসছে আমার। ঠাণ্ডায় আর ভয়ে। তারগুলো অমন করছে কেন? আর শব্দটাই বা কীসের?

পিছনে বাজের শব্দ হতেই সরে এলাম তারের নীচ থেকে। পায়ে পায়ে পিছু হটলাম।

আচমকা খসে পড়ে গেল নীচের তারটা। এতটাই দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, পলক ফেলতেই দেখি আমার ঠিক সামনে ওটা। মাটিতে পড়ে আছে, এক প্রান্ত আলগা-পাক খাচ্ছে। রীতিমত উদ্ভট দেখাচ্ছে জিনিসটাকে।

খাম্বা থেকে পড়ে যাওয়ার কারণটা কী বুঝতে পারলাম না। তার ছেঁড়ার কোন শব্দ তো পাইনি। অথচ ওই তো কালোরঙা প্রকাণ্ড এক সাপের মত ফোঁস-ফোঁস করছে, কুণ্ডলী পাকাচ্ছে ওটা।

ছেঁড়া প্রান্তটা থেকে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই নড়াচড়া করতে শক্তি জোগাচ্ছে তারটাকে।

এবার সহসাই সাপের মত ফণা তুলল ওটা।

বাপরে! গলার কাছে উঠে এসেছে হৃৎপিণ্ড। ঘুরেই দিলাম দৌড়। বাড়িতে বব আছে তো কী হয়েছে!

দুই

গেটে এক হাত রেখেছি, এ সময় গুঞ্জনধ্বনিটা খুব জোরে কানে বাজল। চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালাম। গেট ল্যাচ দেবে বসল হাতের তালুতে। সাইডওয়কের পাশে যে এক ফালি ঘাস জমি রয়েছে সেদিকে দৃষ্টি ফিরালাম। ফণা তোলা তারটা ওখানেই পড়ে ছিল।

ঘাসের বুকে এখনও শুয়ে কালো কুচকুচে তারটা। এক প্রান্ত ফিরে গিয়ে ফের ঝুলে রয়েছে অন্যান্য তারের সঙ্গে। অপর প্রান্তটা পুরো এক মিনিট নিথর পড়ে রইল ঘাসের উপর। ঠায় দাঁড়িয়ে আমি, বুক ধড়ফড়ানির শব্দ পাচ্ছি কানে।

তারটা এসময় পাক খেল আবারও। কালচে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল এক মাথায়। গোটা তারে ফুলকি ছড়াল ক্রিসমাস লাইটের মত-সে সঙ্গে শব্দ করছে কড়-কড়। তারটা ক্রমাগত মোচড় খেয়ে চলেছে। এবার সিধে হলো আবার, সামনে এগোচ্ছে।

প্রচণ্ড জোরে চড় মারল যেন কেউ, এমনি আওয়াজ করে পোলের ধূসর পাওয়ার বক্সটায় ছোবল হানল ওটা। ফুলঝুরির মত ছড়িয়ে পড়ল আগুনের ফুলকি। হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম আমি। আবার যখন চাইলাম, পাওয়ার বক্সটা খোলা দেখতে পেলাম। পোড়া ইস্পাত থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। কালচে, পুরু এক দাগ পড়েছে ওটার গায়ে। বাক্সটার খোলা মুখ থেকে তারটা ঝুলে রয়েছে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সজোরে গেটটা ধরে টান দিলাম। ইয়ার্ডে পা রেখেই পিছনে সশব্দে লাগিয়ে দিলাম গেট। টলতে টলতে ছুটছি, পিছনে চকিত চাউনি বুলালাম।

কী ওটা? প্রায় জ্যান্ত বলে মনে হচ্ছে জিনিসটাকে।

মেঘ গুড়-গুড় করে উঠল। আকাশ থেকে নেমে এল বিজলীর ঝলক। এমনভাবে পড়ল, মনে হলো কোথায় আঘাত করতে হবে জানা ছিল। পিলে

চমকে গেল আমার।

দৌড়ের গতি আরও বাড়ালাম, পা টনটন করছে, পিছনের দরজা লক্ষ্য করে ছুটছি। কড়-কড়, হিস-হিস শব্দটা কিন্তু ঠিকই শুনতে পাচ্ছি। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখব সে সাহস হলো না।

এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ল মাথায়। বাহুর লোম পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল। ছ্যাঁকা দিয়েছে যেন। বাতাস ধাওয়া দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু নিচু, ভরাট শব্দটা বাতাসের শব্দ ছাপিয়ে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।

আমি জানি ওটা বিদ্যুতের তার নয়। তবে কী ওটা?

পিছনের দরজার গায়ে আছড়ে পড়লাম। নবটা চেপে ধরে মোচড় দিলাম। এতটাই কাঁপছে হাত, দু'হাত ব্যবহার করতে হলো। আঙুল পিছলে যাচ্ছে। ঠাণ্ডার কারণে। হাত ভিজে রয়েছে বলে। আর কাঁপছি এ কথা না-ই বা বললাম। নবটা মোচড় দিয়ে ঠেলা দিলাম। দরজা খুলল না। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে উল্টো দিকে মোচড়াতে শুরু করলাম।

এবার বুঝে গেলাম কী ঘটেছে। বব আমাকে বাইরে রেখে দরজা লক করে দিয়েছে।

'বব!' আর্তনাদ ফুটল আমার গলায়। বব হয়তো বাঁকা হাসছে আর্ত চিৎকার শুনে, হাসুক। 'বব!'

দরজায় দুমাদুম কিল মেরে ডাক ছাড়লাম।

সামান্য একটু ফাঁক হলো দরজা। ভিতরে ঢুকবার আগেই একটা হাত বেরিয়ে এল সাপের মতন। আমার টি-শার্ট আঁকড়ে ধরেছে। ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে পিছু হটলাম। বব কিন্তু টি-শার্ট ছাড়েনি আমার।

'ব্যাপারটা কী, বাঁটকু স্যার? বিজলী চমকাতে দেখেই ভয় পেয়ে গেলে?'

ওর হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম।

'ভেতরে ঢুকতে দাও!' ছটফট করছি, লাথি ছুঁড়ছি।

'না!' বব ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে দিল আমাকে।

ওকে থাবড়া মেরে ফাঁক গলে সেঁধিয়ে পড়তে চাইলাম ভিতরে। পিছন থেকে ভেসে আসছে অদ্ভুত সেই গা শিউরানো শব্দটা।

বব কি শুনতে পাচ্ছে না? ও কি বুঝতে পারছে না কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে?

ওই যে, হিসহিস শব্দটা আরও জোরাল হলো।

'বব, ভাই আমার, আল্লার দোহাই আমাকে বাসায় ঢুকতে দাও!' করুণ আর্তি ফুটল আমার কণ্ঠে।

হাসি ফুটল ববের ঠোঁটে।

'এই তো, সোনামণি পথে আসছে!'

অবশেষে দয়া হলো ওর।

'বন্ধ করো! বন্ধ করো!' ভিতরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলাম।

ডান পায়ে লাথি মেরে দরজা লাগিয়ে দিল বব।

ভয়ে থরথর করে কাঁপছি, এসময় দরজায় চাপড় দেওয়ার শব্দে চমকে উঠলাম। কালো তারটা এসে হাজির হলো নাকি?

না, তা নয়। কিশোরের গলা শুনতে পেলাম।

'রবিন, দরজাটা খোলো!' বলল ও।

বব দরজা খুলে দিলে কিশোর আর মুসা প্রবেশ করল ভিতরে। ওরা আমাকে রাস্তা থেকে বাসায় ঢুকতে দেখেছে। ওদেরকে দেখে বুকে সাহস পেলাম।

'কী ব্যাপার, রবিন, তোমার মুখ অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' উদ্বিগ্ন সুরে প্রশ্ন করল মুসা।

বলব কি বলব না ভেবে নিলাম এক মুহূর্ত। ওরা কি বিশ্বাস করবে আমার কথা?

শেষমেশ বলে ফেললাম আগাগোড়া সবই। অদ্ভুত শব্দ, তারের দুলুনি, খসে পড়া, পাওয়ার বক্সে আঘাত হানা, সাপের মত ফণা তোলা–সব, সমস্ত কিছুই খুলে বললাম ওদেরকে। এখন বিশ্বাস করা না করা ওদের ব্যাপার।

'কাউকে ফোন করে জানানো উচিত,' বললাম সব শেষে।

যথারীতি হেসে উঠল বব। উড়িয়ে দিল আমার কথাগুলো।

'যত্তসব গাঁজাখুরী কথা-বার্তা!' বাঁকা হেসে বলল। 'তোমার এসব উদ্ভট কল্পনার কথা শোনাবার জন্যে কাউকে ফোন করছি না আমি।'

অসহায়ের মত বন্ধুদের দিকে চাইলাম। ওরা চুপ করে রয়েছে।

বব আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

মুখ খুলতে যাবে, ঠিক এসময় হঠাৎই কেঁপে উঠে ক্ষীণ হয়ে এল কিচেনের বাতিগুলো।

আমরা ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলাচ্ছি। কিচেনের মত হলরুমের বাতিগুলোও নিভু-নিভু হয়ে এল। আবার যখন আলো বাড়ল তখনও আগের মত উজ্জ্বল হলো না।

'বাইরে গিয়ে কী করেছ তুমি?' কটমট করে চেয়ে রয়েছে বব।

'আমি কিছু করিনি,' তো-তো করে বললাম। 'পাওয়ার লাইনে কী যেন সমস্যা হয়েছে। চাচা-চাচীকে কিংবা পুলিসে জানানো দরকার।'

আবারও কেঁপে উঠল্ বাতিগুলো। নিভেই গের্ল প্রায় এ দফায়। আলো ফিরল বটে, তবে বাড়িটা এ মুহূর্তে অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে।

বব চোখ সরু করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

'ফোন ধোরো না। আমি দেখে আসছি ঘটনাটা কী। আর দরজা আটকানোর চিন্তা করে লাভ নেই। চাবি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে আমার নাকের সামনে দোলাল।

'বাইরে যাচ্ছ?' কোনমতে ঢোক গিলে বললাম।

'চলো আমিও যাই,' প্রস্তাব করল গোয়েন্দাপ্রধান। 'সার্কিট ব্রেকারগুলো চেক করা দরকার।'.

'তোমরা এখানে থাকো,' আমার আর মুসার উদ্দেশে বলল বব। 'কাউকে ফোন্ করতে যেয়ো না।'

আমি বাসায় থাকতে এক পায়ে খাড়া। আমার দিকে কঠোর চাউনি হানল বব। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে কিশোরকে নিয়ে পিছন দরজার উদ্দেশে পা বাড়াল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে, থমকে দাঁড়িয়ে কিচেন ড্রয়ার থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিয়েছে। সজোরে দরজা লাগানোর ফলে দেয়ালে ঝোলানো কাপ-পটগুলো আবারও ঝনঝন করে উঠল।

'চলো, ওরা কী করে দেখি,' বলল মুসা।

পিছন দরজার কাছে হেঁটে এলাম। একটানে খুলে ফেললাম দরজাটা।

বাইরে, রাস্তার বাতিগুলো ইতোমধ্যে জ্বলে উঠেছে, তবে টিম-টিম করছে। ঠিক কিচেনের বাতিগুলোর মত। রাস্তার হলদেটে, লম্বা বাতিগুলোর আলো এসময় ক্ষীণ হয়ে এল, তারপর কেঁপে উঠে নিভে গেল। বাড়িটার চারদিকে নজর বুলিয়ে স্বস্তি বোধ করলাম। আমাদের আলো চলে যায়নি। বাসার ভিতর থেকে রেডিওর শব্দ ভেসে আসছে। বব বোধহয় ভুলে খুলে রেখেছে।

পিছনের উঠনে চোখ রাখলাম।

ববের ফ্ল্যাশলাইটটার আলো উথাল-পাথাল করছে।

ঠাণ্ডা বাতাস ঝাপটা মারল মুখে। দু'বাহু ভাঁজ করে, জড়সড় হয়ে তাকিয়ে রইলাম। বিদ্যুতের তারগুলো দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু কড়-কড়, ভন-ভন শব্দটা ঠিকই শুনতে পাচ্ছি। মুসাকেও কান পেতে শুনতে বললাম।

'সত্যি তো, বড় অদ্ভুত শব্দটা,' মন্তব্য করল ও।

'বব, কিশোর?' মুখের দু'পাশে হাত রেখে চিৎকার করে ডাকলাম।

সাড়া দিল না ওরা। হয়তো শোনেনি। বাড়ির একটা কোণে ঝাঁকি খাচ্ছে ববের ফ্ল্যাশলাইট। একটু পরে, আলো আর ওদের ছায়ামূর্তি হারিয়ে গেল।

অপেক্ষা করছি আমরা।

ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম আরও কিছুক্ষণ। চাচা-চাচীকে ডাকব নাকি? ওঁরা একটা ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন। জরুরী প্রয়োজন হলে যেন যোগাযোগ করতে পারি। আমার কাছে তো জরুরী বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু বব যে নিষেধ করছে!

ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা দেখা যাচ্ছে না আর। তার বদলে, বাড়ির বাতিগুলোকে কাঁপতে দেখলাম আবারও। ক্রমেই অনুজ্জ্বল হয়ে আসছে বাড়ির ভিতরটা।

'যাইছে!' স্পষ্ট আতঙ্ক মুসার গলায়।

'কিশোর, বব?' গলা চড়িয়ে ডাক ছাড়লাম।

কোথায় গেল? ফিরছে না কেন? আমাকে ভয় দেখানোর জন্য এরকম করছে নাকি? ভাবছে, ওকে খুঁজতে যাব আর ও আঁধার থেকে বেরিয়ে এসে 'হোউ' করে চমকে দেবে আমাকে।

'রবিন, সামনের দিকে যাই চলো,' প্রস্তাব করল মুসা। পিছনের দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে ওর সঙ্গে এগোলাম, হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় ওকে দাঁড়াতে বললাম। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলাম উপরতলায়। চাচার ডেস্ক থেকে খানিকটা মাস্কিং টেপ কেটে নিলাম। বড় সিলভার ফ্ল্যাশলাইটটাও সঙ্গে নিলাম। জিনিসটা চাচার অফিস ক্লজিটে থাকে।

এবার দুদ্দাড় করে নীচে নেমে, সদর দরজার ল্যাচে সেঁটে দিলাম টেপটুকু। এখন আর ওটা বন্ধ করা যাবে না।

হল ক্লজিট থেকে দু'জনে দুটো জ্যাকেট বের করে নিয়েছি। এবার পা

রাখলাম বাইরে।

সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। তেমন একটা ঠাণ্ডা লাগছে না। জ্যাকেট পরে নিয়ে আকাশের দিকে চাইলাম। ঘন কালো মেঘ পরস্পর ধাক্কা খাচ্ছে, জমাট বাঁধছে। অশুভ ছায়া বিস্তার করছে যেন শহরটার উপরে।

শিউরে উঠলাম।

'এসো,' ডাকল মুসা। দৌড় দিল।

সাইডওয়াক, রাস্তা সব ভিজে গেছে। ভেজা ঘাসে পা পিছলে যাচ্ছে, বাড়িটাকে পাক খেয়ে এক পাশে চলে এলাম আমরা।

'বব?'

ওদেরকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু ববের ফ্ল্যাশলাইটটা মাটিতে পড়ে। সিলভার সার্কিট ব্রেকার বক্সটা হাঁ হয়ে আছে।

চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে কান পাতলাম। সেই অচেনা শব্দটা শুনতে পেলাম। তারের ভিতর বৈদ্যুতিক গুঞ্জন। উপর দিকে চোখ তুলে চাইলাম।

চাচার বাসার উপর দিয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে তারগুলো। সংযোগ দিয়েছে স্কুলে।

কালো তারগুলোকে অনুসরণ করছে আমার চোখ। বাতাসে দোল খাচ্ছে ওগুলো। বিষধর সাপের মত দেখাচ্ছে।

গলা শুকিয়ে কাঠ। ঘাড়ের কাছে খাড়া হয়ে উঠেছে চুল।

ঠিক এসময় কীসে যেন জ্যাকেট চেপে ধরল আমার।

তিন

ঘুরে দাঁড়াতে দশটা বছর লেগে গেল যেন।

'হোউ!' ববের চিৎকার শুনতে পেলাম।

হেসে উঠল কিশোর আর মুসা।

হো-হো করে হাসছে বব।

'কেমন ভয় দেখালাম ভীতু বেড়ালটাকে!'

'তোমাকে খুঁজতে আসাটাই ভুল হয়েছে!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম।

হেসে উঠে দরজা লক্ষ্য করে দৌড় দিল ও। আমরাও এগোলাম পিছু পিছু।

বাতাসে পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। টোস্টারে অনেকক্ষণ ধরে পুড়ছে যেন পাঁউরুটির টুকরো।

পাঁজরে কনুইয়ের গুঁতো খেলাম এসময়।

'ওই দেখো,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

নীলচে স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়তে দেখলাম। নিশ্চয়ই সেই খসে পড়া কালো, মোটা তারটা। এতক্ষণ কোথায় ছিল ওটা? লুকিয়ে ছিল?

'খাইছে!' অস্ফুট স্বরে বলে উঠল মুসা।

মিনিট খানেক পাক খেল ওটা। তারপর এগোতে শুরু করল বুকে হেঁটে। মৃদু ঝাঁকি খাচ্ছে মাথাটা।

সাক্ষাৎ আজরাইল!

নড়তে চেষ্টা করছি, পারছি না। পায়ে কে যেন আঠা মেখে দিয়েছে।

এক্ষুণি বাসার ভিতরে ঢুকে পড়া উচিত। কিন্তু পারছি কই? জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছি যেন। অনেক সময় হয় না, স্বপ্নে যতই জোরে ছুটতে চাই ততই মন্থর হয়ে আসে গতি?

এটা অবশ্য স্বপ্ন নয়, নিখাদ বাস্তব।

বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় আর ভয়ে কাঁপছি। এদিকে ঘাসের বুক চিরে সাপের মতন এঁকেবেঁকে, আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে এগিয়ে আসছে কালো তারটা।

দেখে মনে হচ্ছে কী যেন খুঁজছে ওটা।

মুসা হামলে পড়ল দরজার উপর। জোর থাবড়া মারছে।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে বারান্দার দিকে কাছিয়ে আসছে ওটা।

ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ রাখছি। নড়বার ক্ষমতা নেই। মনে মনে আশা করছি আমাদেরকে দেখতে পাবে না ওটা। হয়তো দৃষ্টিশক্তিই নেই ওটার। নড়াচড়া করাটা বোধহয় ঠিকও হবে না।

হঠাৎই ফণা তুলল ওটা।

কিশোর আর মুসা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ববকে ডাকছে। দরজা খুলতে এত দেরি করছে কেন ও?

পেটের ভিতরটা ফাঁকা হয়ে এল আমার।

তারটা পিছু হটল, যতক্ষণ না মাথায় আমাকে ছাড়িয়ে গেল। চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করছে। চোখের পলকে এবার ছোবল হানল ওটা।

চাচীর অটোমেটিক ওয়াটারিং সিস্টেমে ছোবল মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেছে মেশিন। পানি ছড়িয়ে পড়ছে লনে।

বারান্দার কাছে নল লাগানো যে পিপেটা রয়েছে সেটিকে পেঁচিয়ে ধরল তারটা। এমনভাবে পাক খেয়েছে, ছাড়বে না যেন কোনমতেই।

ধীরে ধীরে কমে এল পানি পড়ার গতি। ওদিকে ক্রমেই ফুলে মোটা হয়ে উঠল তারটা।

অবশেষে বিকল হয়ে গেল ওয়াটারিং সিস্টেম।

এবার ঘটল সবচাইতে আশ্চর্য ঘটনাটা।

ইলাস্টিক রাবার ব্যান্ডের সঙ্গেই কেবল-এর তুলনা করা চলে। 'ফট' করে একটা শব্দ। পরমুহূর্তে অন্যান্য তারের কাছে ফিরে গেল এটাও। দিব্যি স্বাভাবিক একটা দৃশ্য!

ইতোমধ্যে দরজা খুলেছে বব।

'ওটা বাইরে ওত পেতে আছে,' ভিতরে ঢুকে শ্বাসের ফাঁকে বলল মুসা। চোখে-মুখে ত্রাস ফুটে উঠেছে।

বুক ধড়ফড় করছে আমার। ভয় হলো হৃৎপিণ্ড ফেটে না যায়।

'এখুনি কাউকে জানানো দরকার,' গোয়েন্দাপ্রধান জরুরী কণ্ঠে বলল। 'বাড়ির ইলেকট্রিসিটি খেয়ে ফেলছে ওটা!'

বব আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

'গুলপট্টির কোম্পানী খুলেছ নাকি তোমরা? সব শেয়ালের এক রা দেখতে পাচ্ছি।'

ওর কথা কানে তুললাম না।

'আমি চাচাকে ফোন করছি!'

আমার বাহু আঁকড়ে ধরল বব।

'কোথাও ফোন করছ না! এদিকে এসো।' সঙ্গে করে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল সামনের জানালাগুলোর কাছে।

চোখের কোণে লক্ষ করলাম মুসা এক পা এগিয়েছিল। কিন্তু কিশোর ওর কাঁধে চাপ দিয়ে থমকে দিল।

'বাইরে কী দেখেছ বলো। আমি তো গোলমেলে কিছু দেখছি না। পাওয়ার বাড়ছে-কমছে, ব্যস। এর জন্যে বাবাকে ডাকতে হবে কেন?'

জানালা দিয়ে বাইরে চাইলাম।

বাতাসে দোল খাচ্ছে বিদ্যুতের তার। এর মধ্যে কোনরকম অস্বাভাবিকতা নেই। কোন তার আলগা হয়ে ঝুলে নেই, শব্দ করছে না–ফুলকি ছড়াচ্ছে না। চাচীর মেশিন থেকে কেউ গিলে খাচ্ছে না তাজা বিদ্যুৎ।

'ওটা ওখানে ছিল, পাওয়ার লাইনে। মাটিতে খসে পড়ে বিদ্যুৎ খেতে শুরু করে।' খুব আস্তে আস্তে, জোর দিয়ে উচ্চারণ করলাম শব্দগুলো। ওর মাথায় যাতে ঢোকে।

তেরছা চোখে চাইল আমার দিকে বব। মুখ খুলতে যাবে এসময় কাঁপতে শুরু করল লিভিং রুমের বাতিগুলো।

নিথর দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। পুতুলের মত।

এক মুহূর্ত পরে বব কাছে টেনে নিল আমাকে।

'তোমাকে শেষবারের মত সাবধান করে দিচ্ছি। আমাকে বোকা বানাতে চেষ্টা কোরো না। এসবই তোমার কারসাজি।'

'বিশ্বাস করো,' মিনতি করে বললাম, 'আমি কিচ্ছু করিনি।'

'যদি দেখি তুমি মিথ্যে বলছ তা হলে কিন্তু–'

'আমি মিথ্যে বলছি না!' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলাম। 'এবং চাচাকে এখুনি ফোন করছি আমি!'

'তবে রে–'

ঘুরেই সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটলাম। পিছু ধাওয়া করল ও। কিন্তু ওর আগেই চাচা-চাচীর রুমে ঢুকে পড়েছি আমি। দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিয়ে, ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলাম।

বব দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। থাবা দিয়ে কেড়ে নিল রিসিভারটা।

জোর খাটালাম না আমি। খাটাবার কোন কারণ নেই। কেননা ফোনটা ডেড।

'ফোনলাইনটাকেও ছাড়েনি ওটা,' বললাম ববের দিকে অপলক চেয়ে থেকে।

ইতোমধ্যে কিশোর আর মুসাও উঠে এসেছে এ ঘরে।

আমার উদ্দেশে বাঁকা চাউনি হেনে, রিসিভারটা কানে ঠেকাল বব।

mmsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com

তারপর সুইচটা বার কয়েক খটখটিয়ে রেখে দিল।

'ঝড়ে ফোন লাইনেরও ক্ষতি হয়েছে, আর কিছু না।'

'তা না হয় হলো। কিন্তু আলো নিভে যাচ্ছে কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'ঝড় হয়েছে বলে।'

'তা হলে সব আলো নিভল না কেন? পুরো বাড়ির পাওয়ার চলে যায়নি কেন? এর কারণ, তারের পিশাচটা একটু একটু করে কারেন্ট খাচ্ছে।' যুক্তি দেখিয়ে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

'তা ছাড়া আমরা সবাই মিথ্যা কথা বলছি তা-ই বা ভাবছ কেন?' বললাম আমি।

'তোমরা তো এক দল।' বলে গটগট করে ঘর ত্যাগ করল বব। ওকে অনুসরণ করলাম তিন বন্ধু।

বব গিয়ে ওর রুমে ঢুকেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে ওকে রেডিও ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেখলাম আমি।

'বব?' ডাকলাম।

জবাব দিল না।

'বিশ্বাস করো, আমি বানিয়ে বলছি না। যা বলছি অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

আমার দিকে তাকাল না ও। একটা কাঁধ শুধু উঁচু করল।

'যাও ভাগো, বাঁটকু কোথাকার!'

'বব, ওটা যদি এখানে এসে ঢোকে?'

শেষমেশ দয়া হলো ওর। মুখ তুলে চাইল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সটান উঠে দাঁড়াল।

'ঘরে গিয়ে পর্দা টেনে বসে থাকো। ফ্ল্যাশলাইট নিভিয়ো না। আর শোনো, আমাকে আর এ নিয়ে জ্বালাতন করতে আসবে না।'

মুখের উপর দরজা লাগিয়ে দিল ও।

হলঘরে কিশোর আর মুসার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রইলাম দীর্ঘক্ষণ। রুমের আলো ক্রমেই অনুজ্জ্বল হয়ে আসছে. দৃশ্যটা মোটেই সুখকর নয় আমাদের জন্য।

তিন বন্ধু সোজা আমার ঘরে চলে এলাম। খাটে বসে জানালা দিয়ে চেয়ে রইলাম স্থির দৃষ্টিতে।

'দেখো, দেখো,' একটু পরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল মুসা। 'পাওয়ার লাইনগুলো আবারও দুলছে।'

পাতলা কাঁচ ভেদ করে ওপাশের ছবি স্পষ্ট চোখে পড়ে।

জোর বাতাস দিচ্ছে। গাছের ডাল দেয়ালে বাড়ি খেলে যেরকম শব্দ হয় তেমনি এক শব্দ কানে আসছে আমার। বন্ধুরাও শুনতে পাচ্ছে। অস্থির লেগে উঠল আমার।

ঘরটা ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে, কিন্তু আলো জ্বালবার ইচ্ছে হলো না কারও। আলো ম্লান হয়ে আসছে দেখতে চাই না আর। কাজেই ঠায় বসে রইলাম তিন জনে।

ওভাবেই হয়তো বসে থাকতাম, যদি না কোন কিছুর বাড়ি খেয়ে কাঁচ ভেঙে পড়ত ঝন-ঝন করে।

হলঘরে ছুটে গেলাম আমরা। ববও বেরিয়ে এসেছে।

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে চাচা-চাচীর ঘরের দিকে পা বাড়ালাম আমরা। কাঁচ ভাঙার শব্দটা ওদিক থেকেই এসেছে।

ববকে অনুগমন করলাম হলঘর ধরে।

'বব!' ওর নাগাল ধরল কিশোর। মুঠো পাকানো ওর।

থমকে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চাইল বব।

ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়ল গোয়েন্দাপ্রধান।

'ভিতরে যেয়ো না।'

মুখে তাচ্ছিল্যের শব্দ করল বব। তারপর আবার হাঁটা দিল কামরাটা লক্ষ্য করে।

বুকের খাঁচা ভেঙে যেন বেরিয়ে আসবে হৃৎপিণ্ড। ববকে যে নিষেধ করব, স্বর ফুটল না গলায়। ওর যা ইচ্ছে করুক। আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব। যা থাকে কপালে।

দরজাটা ঠেলে ভিতরে পা রাখল ও।

দোরগোড়ার কাছ থেকে ছিটকে এল আলোর ঝলক। ঘরের রেডিওটা চড়া শব্দ করে আচমকা থেমে গেল।

চিৎকার ছাড়ল বব। দৌড়ে বেরিয়ে এল ঘরটা থেকে। দড়াম করে পিছনে লেগে গেল দরজা। শব্দ পেলাম কী যেন একটা আছড়ে পড়ল দরজার গায়ে।

চমকে পিছে সরে গেল কিশোর।

মুহূর্ত পরে নিঃশব্দ হয়ে গেল কামরাটা।

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল বব। চোখজোড়া বিস্ফারিত, মুখের চেহারা রক্তশূন্য।

'কালো রঙের মস্ত বড় একটা তার, তাই না?' গলা শান্ত রেখে বললাম।

মাথা ঝাঁকাল বব। হাতের দিকে চাইল। এবার হাত দুটো বুকের কাছে তুলে ধরল ফাঁক করে। মনে হলো বেসবল ধরে রেখেছে।

'বিরাট বড়। আর লম্বায়...' বাহু ছড়িয়ে দিয়ে বোঝাতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। 'জানালা দিয়ে বেরিয়ে আছে, এতটাই লম্বা।'

পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠল আমার। মাটিতে যখন দেখেছি তখন বেসবলের মত গোলগাল ছিল না ওটা।

'খাইছে! তারমানে বাড়ছে ওটা,' মুসা ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল।

বব স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

এসময় উপরতলার আলোগুলো কেঁপে উঠে নিভে গেল। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। পরক্ষণে আবার ফিরলাম ববের উদ্দেশে।

'বব, আমি যখন ট্রী হাউসে বসা তখন মিস্টার পাইকের বাসাতেও এরকম হতে দেখেছি। বাতিগুলো মিট-মিট করে নিভে গেছে।'

বব আমার মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরায়নি। এবার সটান সিধে হলো ও।

'ওটাকে খেদাতে হবে।'

গটগট করে রুমে ঢুকে বেসবল ব্যাটটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

কিশোরের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে।

'কী হবে ওটা দিয়ে?'

হাতের তালুতে ব্যাট চাপড়াল বব।

'শয়তানটাকে আচ্ছামত পিটাব,' গর্জে উঠল ও।

ওকে বারণ করে লাভ নেই। শুনবে না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে ও। স্পষ্ট বুঝতে পারছি বিপদ ডেকে আনতে চলেছে।

'স্রেফ মারা পড়বে,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ওটার সঙ্গে লাগতে যেয়ো না।'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। দরজার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানছে বব। বুক চিতিয়ে চাচা-চাচীর ঘরের উদ্দেশে পা বাড়াল।

ডোরনবে হাত রাখতে দীর্ঘক্ষণ লেগে গেল ওর। মোচড় দিতে লাগল আরও বেশি। জিন্সের পিছনে হাত মুছে নিল। শক্ত করে চেপে ধরল ব্যাটটা। আমার দিকে এক পলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, আস্তে করে খুলে ফেলল দরজাটা।

ইচ্ছে করছে কানে হাত চাপা দিই, চোখ বুজে ফেলি। থরথর করে কাঁপছি। কানে আসছে হৃৎপিণ্ডের ঢিব-ঢিব শব্দ।

অপেক্ষা করছি আমরা।

নিঃশব্দ। একটুখানি সামনে এগোলাম। এবার আরেকটু। ঘরের ভিতরে চোখ রাখতে পারি এমনি দূরত্ব রেখে থেমে পড়লাম।

ঘরের ভিতর বিশ্রী দুর্গন্ধ। বেহাল দশা।

কালো পোড়া দাগ আঁকাবাঁকা, যোগচিহ্নের মত-সব রকমের।

দাগগুলো এসেছে ভাঙা জানালা পথে। ছড়িয়ে গেছে ঘরের সবখানে। অ্যালার্ম-ক্লক রেডিও, বিছানার পাশের বাতি, চাচীর হেয়ার ড্রায়ার, ড্রেসারের উপর রাখা ছোট্ট টিভিটা-কোন কিছুই বাদ যায়নি।

কামরাটা এ মুহূর্তে একদম নীরব।

ভিতরে ঢুকে পড়ল মুসা। তুলে নিল চাচার শেভারটা। ফেলেও দিল সঙ্গে সঙ্গে। হাতে ছ্যাঁকা দিয়েছে তপ্ত প্লাস্টিক। কেসিং থেকে গলে-গলে পড়ছে ব্যাটারি।

ড্রেসারের কাছে হেঁটে গেল কিশোর। চাচার ডিজিটাল ঘড়ির ব্যাটারি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরোচ্ছে। এটাকেও খেতে ছাড়েনি কালো পিশাচ।

'বাবা বাড়ি ফিরে বোকা বনে যাবে,' নিচু স্বরে বলে উঠল বব।

ভাঙা জানালা ভেদ করে ঠাণ্ডা বাতাস আর বৃষ্টির ছাঁট ঢুকছে।

চাচা গত মাসে বাসায় সেন্ট্রাল হিটিং বসিয়েছেন। কিন্তু ঠাণ্ডা বাতাসের কামড়ে মনে হচ্ছে হীট বুঝি অফ হয়ে গেছে। একটা বালিশ তুলে নিয়ে আলগোছে জানালার কাছে চলে এলাম। বাইরে চেয়ে পাওয়ার লাইনে কোন নড়াচড়া দেখলাম না। এবার গর্তটার ভিতর ঠেসে দিলাম বালিশটা।

হঠাৎই 'থপ' করে বিদঘুটে এক শব্দ। চরকির মত ঘুরে দাঁড়ালাম। ববের দিকে দৃষ্টি।

'তুমি করলে আওয়াজটা?'

মাথা নাড়ল ও।

কিশোর এসময় আঙুল তাক করল। ঘুরে চাইলাম। বিছানার কভার দুমড়ে মুচড়ে গেছে। ড্রেসার থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছে জিনিসপত্র।

এবার অন্য এক দৃশ্য দৃষ্টি কেড়ে নিল আমার।

বাঁকা সেন্ট্রাল এয়ার ভেন্ট। ওখান অবধি বিছিয়ে গেছে কালো পোড়া দাগগুলো।

'দেখেছ...' ভেন্টটা আঙুল ইশারায় দেখালাম।

ধীর, সতর্ক পায়ে খোলা ভেন্টের কাছে হেঁটে এল মুসা। চারকোনা গর্তটা খুঁটিয়ে পরখ করল।

'এখনও বাড়ির ভিতরে রয়েছে ওটা,' গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করল।

আবারও থপ-থপ শব্দটা পেতেই মুখ তুলে চাইলাম চারজনে।

'চিলেকোঠায় ঢুকেছে,' বলল বব। দরজার দিকে হনহন করে এগিয়ে গেল।

'বব, শব্দটা চিলেকোঠায় নয়, দেয়ালে। মন দিয়ে শোনো,' বলে উঠল কিশোর।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বব।

কান পেতে শুনছি সবাই। ববের রেডিওটা হঠাৎই থেমে গেল।

মুঠো পাকাল বব।

'আমার ঘরে!'

এক ছুটে বেরিয়ে গেল ও।

আমরা পিছন পিছন ছুটলাম। ওকে নাম ধরে ডাকছি।

কোন সন্দেহ নেই, ওর রুমে গিয়েই ঢুকেছে ওটা।

চার

কালো পিশাচটা এখন আরও বড় হয়েছে আকারে। অবিকল মোটা-তাজা, পিচ্ছিল এক বাণ মাছের মত দেখাচ্ছে।

চোখ নেই, তাই তার ছাড়া আর কিছু ভাবা যাচ্ছে না। মুখ অবশ্য রয়েছে। কিংবা মুখের মত কিছু একটা। এক প্রান্তে একটা ফুটো শুধু। ভিতরটা ফাঁপা থাকলে একটা তারকে যেমন দেখায় আরকি।

এটার ভিতরে অবশ্য কী যেন আছে। জিনিসটা কী স্পষ্ট করে না হলেও

দেখতে পাচ্ছি। নড়ছে তারের ভিতরে। ঠিক কিলবিলে কেঁচোর মতন।

তারটা ফুলকি ছড়িয়ে পাক খাচ্ছে, এদিক-সেদিক হড়কে যাচ্ছে আর পিলে চমকানো কড়-কড় শব্দ করছে। জানান দিচ্ছে বিদ্যুৎ বহন করছে। যে কোন মুহূর্তে মরণ ছোবল হানতে পারে।

যখনই নড়ছে মুখ থেকে শোঁ-শোঁ শব্দ বেরোচ্ছে। পিছনে রেখে যাচ্ছে চওড়া, কালো পোড়া চিহ্ন।

পিছনের অংশটুকু হীটার ভেন্ট গলে নেমে গেছে চোখের আড়ালে। বাকি দেহটা ঘরের চারদিকে আছড়ে পড়ছে। তার ফলে ববের ডেস্ক আর শেলফ থেকে ছিটকে পড়ছে জিনিসপত্র।

ববের ঠিক পিছনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমি। আমার পিছে কিশোর ও মুসা।

কালো তারটা শূন্যে শরীর মুচড়ে সপাং করে মাটিতে আছড়ে পড়ল চাবুকের মত। এবার ফণা তুলে দুলতে লাগল আমাদের সামনে। দেখে মনে হলো কী যেন খুঁজছে।

ববের মুখের কাছে এসে সামনে-পিছনে দোল খেল। পরমুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর সিডি প্লেয়ারের উপর।

কাঁচা ঘুম ভেঙে তড়াক করে উঠে বসল যেন বব। ক্রুদ্ধ চিৎকার ছেড়ে এগিয়ে গেল। সজোরে ব্যাট হাঁকিয়েছে।

ওকে টেনে ধরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বেসবল ব্যাটটা 'সাঁই' করে পিছনে এনে বাড়ি মেরেছে বলে মাথা নোয়াতে হয় আমাকে।

কালো পিশাচটার শরীরের এক পাশে লেগেছে আঘাতটা। পোড়া দুর্গন্ধে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম।

বিজলী চমকে উঠল। এক ঝাঁক সাদা রেখা মুহূর্তে গিলে খেল ববের ব্যাটটা।

'খাইছে!' মুসার অস্ফুট কণ্ঠ।

স্ফুলিঙ্গ ছিটকে উঠে পেঁচিয়ে ধরল ববের বাহু। ঠিক যেন জ্যান্ত তার।

আর্তনাদ করে উঠল বব। এক চুল নড়ল না ও। সারা দেহে কাঁপুনি উঠে গেছে। বেসবল ব্যাট ইতোমধ্যে চলে গেছে পিশাচটার পেটে।

'হ্যান্ডেলটা ছেড়ে দাও, বব!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'পারছি না! পারছি না!' ফুঁপিয়ে উঠল বব। ঝাড়া মেরে বাহু মুক্ত করতে

চাইছে। 'সরাও এটাকে! সরাও!'

হাতল বেয়ে ববকে লক্ষ্য করে এগোচ্ছে তারটা।

মুসা লাফিয়ে সামনে এগোল।

হিসহিসিয়ে উঠে চোখের পলকে পাক খেল ওটা। শরীরের একাংশ তখনও হাতল জড়িয়ে ধরে রেখেছে। এবার কেঁচো ভর্তি হাঁ-টা উঁচু হলো।

ওটা দেখতে পায় না। ওটা দেখতে পায় না। ওটা দেখতে পায় না। কথাগুলো ক্রমাগত আওড়ে চলেছি মনে মনে। সত্যি কিনা জানি না। আশা করছি, যেন সত্যি হয়।

কালচে বিজলী এখন দু'বাহু সম্পূর্ণ পেঁচিয়ে ধরেছে ববের। ঝাঁকি খেয়ে এদিক-সেদিক ছিটকে পড়ছে ও, লাফাচ্ছে।

মুসা বেশি কাছে চলে গেলে কী ঘটবে? ওকেও কি ধরে বসবে পিশাচটা?

মুখের ভিতরটা শুকনো ঠেকছে। গা শিউরে উঠল।

এক পা আগে বাড়ল মুসা। তারপর আর দ্বিধা করল না। কাজটা বোকার মত হলেও, ববের বাহুর পিছনটা আঁকড়ে ধরল ও।

ঝাঁকুনিটা বোধহয় সারা জীবনেও ভুলতে পারবে না ও। দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়ল মুসা। ছ্যাঁকা খাওয়া আঙুলগুলো পরখ করছে ভীতিমাখা চোখে।

স্পর্শ করলেই যদি এ রকম দশা হয় তবে ববের কেমন লাগছে?

গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করছে বব। এতটাই জোরে, তারের কড়কড়ানি ছাড়া আর কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না।

কালো পিশাচটা দোল খেল, ববের মুখের কাছে এখন আবার ওটার বীভৎস হাঁ।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। এক পা তুলে জুতো খুললাম। এবার অপর পাটিটাও।

ফোঁস-ফোঁস করে পিশাচটা পিছিয়ে গিয়েছিল। এখন যেই আবার চাবুক হানল, দস্তানার মত হাতে পরে নিলাম জুতোজোড়া। রবারের সুকতলী ববের দিকে বাগিয়ে ধরা।

এবার চোখ বুজে, ববের শরীরের দু'পাশে সজোরে আঘাত করলাম। বেসবল প্র্যাকটিসের মত শরীর দুলিয়ে, হাতের জুতোজোড়াকে বাড়ি খাইয়েছি ববের গায়ে। এতই জোরে মেরেছি, বাহু থেকে কাঁধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল ব্যথা।

ঘুরে দাঁড়ালাম বোঁ করে। তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম পায়ে পা জড়িয়ে। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে আছি, মাথার একটু উপরে ছোবল হানল কীসে যেন। চোখ মেললাম।

ব্যাটটা খসাতে পেরেছি ববের হাত থেকে। আমার পাশে মেঝেতে পড়ে রয়েছে ও।

আমাদের মাথার উপরে দুলছে, ঘুরছে, ফোঁস-ফোঁস শব্দ করছে কালো পিশাচ। দেখে মনে হচ্ছে আমাদেরকে খুঁজছে।

'তোমরা নড়াচড়া কোরো না,' কিশোর অনুচ্চ, জরুরী কণ্ঠে বলে উঠল। 'প্রথম সুযোগেই টেনে সরিয়ে নেব তোমাদের।'

থমকে গিয়ে ব্যাটের হাতলটা ছেড়ে দিয়েছে ওটা। এবার কুণ্ডলী পাকিয়ে কুৎসিত মুখটা এপাশ-ওপাশ দুলাচ্ছে। ভঙ্গিটা এমন যেন গন্ধ শুঁকে পথ চিনে নিতে চাইছে কুকুর।

কার্পেটে মুখ রেখে পড়ে আছে বব। কাঁদছে। ওর আঘাত কতখানি গুরুতর বুঝতে পারছি না।

'এসো,' ফিসফিস করে বলে উঠল মুসা। ভয় পাচ্ছে পিশাচটা শুনে ফেলে কিনা। আমার দু'হাত চেপে ধরে টানছে পিছনদিকে। চোখের কোণে দেখলাম ববকে টেনে সরিয়ে নিচ্ছে কিশোর।

গাল ভেজা-ভেজা ঠেকছে। টের পেলাম ঘাম নয়—অশ্রু।

কালো তারটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ধীরে সুস্থে আমাদের উদ্দেশে দোল খেয়ে এগোচ্ছে। ভেবেছিলাম বিদ্যুৎ গতিতে আঘাত হানবে। কিন্তু ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ওটা। মোটা আর শ্লথ।

আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে চলেছে এখনও। ঘরটার দেয়ালে নেচে বেড়াচ্ছে কালো-কালো ছায়া।

শীঘ্রি পালাতে হবে এখান থেকে।

ইতোমধ্যে আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে কিশোর আর মুসা।

এসময় কিশোরের কান ঘেঁষে চলে গেল পিশাচটার হানা ছোবল। পরক্ষণে মাথা নোয়াল ওটা।

চোখ নেই, কিন্তু নোয়ানো মাথা দেখে মনে হচ্ছে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

মাটি থেকে তুলে নিলাম একটা ব্যাটারি। ছুঁড়ে মারলাম ওটাকে উদ্দেশ্য করে।

ববের শেলফ থেকে নিশ্চয়ই পড়ে গিয়েছিল ব্যাটারি। পিশাচটার পাশ কেটে চলে গেল। যথারীতি লক্ষ্যভ্রষ্ট। কিন্তু চাবুকের শব্দ তুলে পাঁই করে ঘুরে গেল ওটা। ছোঁক-ছোঁক করে ব্যাটারিটার দিকে এগোল।

আমার দেখাদেখি মুসাও একটা ব্যাটারি ছুঁড়ে মেরেছে। কিশোর ববের হেডফোন আর ওয়াকম্যান খুঁজে পেয়ে ছুঁড়ে দিল। মনে হচ্ছে একটা ক্ষুধার্ত বিদ্যুৎচালিত বাঘকে ছিটেফোঁটা খাবার জোগাচ্ছি আমরা।

কিলবিল করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে পিশাচটা। ববের ওয়াকম্যানটার দিকে সাপের মত সড়সড় করে এগিয়ে গেল।

'খাইছে!'

মেরুদণ্ড বেয়ে হিমস্রোত বয়ে গেল আমার। পোড়া গন্ধে ভরে গেল ঘর।

কাশতে কাশতে দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

আর দেরি করলাম না। ঘুরেই দৌড় দিলাম দরজা লক্ষ্য করে। কিশোর আর মুসাও অনুসরণ করল আমাকে। কিশোর জড়িয়ে ধরে দৌড়তে সাহায্য করছে আহত ববকে।

হলঘর পর্যন্ত গিয়ে আর পারল না বব। পড়ে গেল হাঁটু ভেঙে।

'ওঠো! উঠে পড়ো!' চেঁচালাম আমি। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। কাঁপা, কালচে হাতে চেপে ধরল আমার জ্যাকেটের কলারের কাছটা।

কী যেন বলতে চাইছে। গলায় স্বর ফুটছে না। নিচু হয়ে মুখের কাছে কান নিয়ে গেলাম।

'বাঁটকু, তুমি আমাকে জুতো পেটা করেছ,' কোনমতে উচ্চারণ করল। 'এর ফল টের পাবে হাড়ে হাড়ে।'

খুশিতে দাঁত বেরিয়ে পড়ল আমার। তার মানে আঘাত তেমন গুরুতর নয়। মোটামুটি সুস্থই আছে ও।

ওর মুখখানা অবশ্য নীল হয়ে রয়েছে। বাহু দুটো কালচে-নীল রং ধারণ করেছে। ডান হাতটা মরা সাপের মত ঝুলে রয়েছে। যে কেউ দেখলেই বুঝবে, ভয়ানক অত্যাচার সইতে হয়েছে বেচারাকে।

'আমাদের এখুনি পালাতে হবে,' তাগিদ প্রকাশ পেল গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠে।

'আমার সব শেষ,' বলে নিজের কামরার দিকে ঘুরে দাঁড়াল বব। বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ওর কামরাটা এখন আশ্চর্য রকম নীরব। ঠিক যেন মৃত্যুপুরী। এমনকী পোড়া গন্ধটা পর্যন্ত দ্রুত উবে যাচ্ছে।

ববের দিকে চকিতে চেয়ে ঘরটার উদ্দেশে চোখ ফিরালাম। উৎকণ্ঠা বোধ করছি।

'এক মিনিট।'

ওদেরকে দাঁড়াতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম কামরাটা লক্ষ্য করে।

মোটেও ইচ্ছে নেই, তারপরও জানি উঁকি দিতে হবে ভিতরে।

পিশাচটা ওখানে রয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে।

নেই।

ধীরে-সুস্থে পা রাখলাম ঘরের ভিতরে। চাচার ঘরের চাইতে অনেক বেশি বেহাল দশা এটার। একেবারে তছনছ হয়ে গেছে।

মেঝেতে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে চেরা ব্যাটারি। ভিতরে কিচ্ছু নেই। ববের ওয়াকম্যান, সিডি প্লেয়ার, রেডিও–এসব দেখে মনে হচ্ছে পোড়ানো হয়েছে বুঝি আগুনে।

পিছনের দেয়ালে আচমকা থপ করে এক শব্দ। আঁতকে উঠে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়ালাম। এক ছুটে চলে এলাম বন্ধুদের কাছে। শ্বাস ফিরে পেলে জানালাম, 'ওটা সরে গেছে।'

মুখ তুলে চাইলাম আমরা উপর দিকে। বাড়ির অন্য কোনওখান থেকে আসছে শব্দটা।

'বাড়ি ছাড়তে হবে,' ফিসফিস করে বলল বব। দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিল ও। হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু পারল না। আঙুলগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেছে। হাতের দিকে দু'মুহূর্ত চেয়ে রইল ও।

'আঙুল নাড়তে পারছি না।' গলা কেঁপে গেল।

মুসা এগিয়ে এল। আঙুলগুলো ম্যাসেজ করে দিল।

'কাদামাটির মত লাগছে,' মন্তব্য করল। ঠাণ্ডা আর অসাড়। ওকে

চিমটি কাটল মুসা।

'আউ!' কাতরে উঠল, কিন্তু হাত সরিয়ে নিল না বব।

'ব্যথা যখন লাগছে কোন চিন্তা নেই,' বলল কিশোর। 'ঠিক হয়ে যাবে।'

তা না হয় হলো, কিন্তু এখন কী হবে? বললাম মনে মনে।

মাথা ঝাঁকাল বব। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। ঘামছে দর-দর করে। উপরের ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে।

'তোমরা একটু সাহায্য করলেই হবে। বেরিয়ে যেতে পারব এখান থেকে,' বলল।

বাহু ধরে টেনে তুললাম ওকে।

'কিশোর?' ডাকলাম।

'বলো।'

'ওটাকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কীভাবে?'

'ওটা আমাদেরকে খুঁজছে না। দেখলে না, শুধু কারেন্ট আর ব্যাটারি শুষছে? বব ব্যাট না চালালে ওকেও কিছু বলত না।'

সিঁড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালাম ববকে নিয়ে। মুসা আর কিশোর চলেছে আমাদের সামনে।

দেয়ালের আশপাশ ঘেঁষে, সাপের মত এঁকেবেঁকে চলাফেরা করছে কালো পিশাচ। ভাবনাটা মাথায় আসতেই বুক হিম হয়ে এল।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম আমরা।

লিভিং রুমে থপ-থপ শব্দ করে উঠল কীসে যেন। ঘুরে দাঁড়ালাম লাটিমের মত। কিছুই অবশ্য চোখে পড়ল না।

'কিশোর, শুনলে?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করলাম। সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেছি।

অদ্ভুত শব্দটা শুরু হয়েছে আবারও—সেই ভন-ভন, হিস-হিস শব্দ।

কিশোর মুখে কিছু বলল না। ঠোঁটে আঙুল ঠেকাল শুধু। 'শশ...'

সদর দরজার দিকে আলগোছে এগিয়ে যাচ্ছি চারজনে।

ভন-ভন গুঞ্জনধ্বনি বেড়ে গেল হঠাৎই। চোখ পিটে চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল মুসা।

কোথায় ঘাপটি মেরে রয়েছে পিশাচটা?

বলা নেই কওয়া নেই, হীটার ভেন্টের ভিতর থেকে সপাং করে মেঝেতে

আছড়ে পড়ল ওটা।

চোখের পলকে লাফিয়ে সিধে হলো, ববের পায়ের সমান মোটা তারটা।

আগুন উগরাচ্ছে হিস-হিস শব্দ করে। কুৎসিত হাঁ-টা এতটাই বড়, অনায়াসে আমার মুঠো গলে যাবে।

'খাইছে!' ভয়ার্ত আর্তনাদ ছেড়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। দৌড় দেবে।

কালো পিশাচ হিসিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল। ওর এ ভঙ্গি আগেও দেখেছি। এখুনি চাবুকের মত আঘাত হানবে ওটা।

ইতোমধ্যে আমাকে শরীরের ধাক্কায় পিছনে ঠেলে দিয়েছে বব। এবার অসাড় হাতের ঝটকায় একটা ল্যাম্প উল্টে দিল।

মাটিতে পড়েই জ্বলে উঠল ল্যাম্পটা। আর কালো পিশাচ নিমেষে পেঁচিয়ে ধরল ওটাকে। কে বলবে চোখে দেখে না?

'দৌড় দাও!' চিৎকার ছাড়ল বব।

চারজনেই দৌড় দিলাম ঝেড়ে। হলঘর পেরিয়ে চলে এলাম কিচেনে। পিছনে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে, মেঝেতে শরীর আছড়াচ্ছে পিশাচটা।

পিছনের দরজাটা খুলে ফেলল কিশোর। একে একে বেরিয়ে এলাম আমরা।

শ্বাস টানছি, বুক ব্যথা করছে আমার। ছোট-ছোট শ্বাস নিচ্ছি ফোঁপানির মত শব্দ করে। কাঁধ দুটো টন-টন করছে। মুখে হুল ফুটাচ্ছে ঠাণ্ডা। তারপরও ঘাম গড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে আমার নাক-মুখ-চোখ সবখান থেকে পানি ঝরছে।

দৌড়চ্ছি আমরা, ধাক্কা খাচ্ছি পরস্পরের গায়ে।

প্রকাণ্ড ওক গাছটার কাছে এসে থামলাম।

'আমাদের অসুবিধা হবে না,' বললাম, 'কিন্তু, বব, তুমি কি উঠতে পারবে?' ট্রী হাউসটা আঙুল ইশারায় দেখালাম।

মুখ তুলে এক ঝলক চাইল। তারপর নিজের হাতজোড়ার দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করল বব।

'রবিন,' শ্বাসের ফাঁকে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'কী দরকার অত কষ্ট করার? তার চাইতে দূরে কোথাও চলে যাই চলো।'

'কিশোর ঠিক বলেছে,' সায় জানাল বব। দৌড় দিল গেটের দিকে।

'এসো!' জরুরী কণ্ঠে তাড়া লাগাল।

গেটের ল্যাচ হাতড়াচ্ছে বব, খুলতে পারছে না। মুসা এগিয়ে এল। বব সরে দাঁড়িয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

গেট খুলতে জীবন পার করে দেবে যেন মুসা। অনুভব করছি, ঠাণ্ডা আর কাঁপুনি কাজটায় বাধা দিচ্ছে ওকে। অবশেষে তিনবারের চেষ্টায় গেট খোলা গেল।

দুদ্দাড় করে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমরা। রাস্তা ধরে দৌড় দিয়ে খোলা, ফাঁকা মাঠটায় ঢুকে পড়লাম।

পেটের এক পাশে খিঁচ ধরে গেছে। ববের শার্ট টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলাম।

কিশোর আর মুসাও থমকে দাঁড়িয়েছে।

হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছি আমি।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ববকে জিজ্ঞেস করলাম।

'যত দূরে সম্ভব।'

মাথা নাড়লাম আমি।

'তা সম্ভব না, বব। চাচা-চাচীর কী হবে? তাঁরা যখন ফিরবেন? ওটা যদি তখনও ওখানে থাকে?'

আমার দিকে এক নজর চেয়ে হাতের তালুর উপর দৃষ্টি রাখল বব। দাঁতে দাঁত পিষে মুঠো করতে আর খুলতে পারল ও। এবার আমার কাঁধে হাত রেখে ঘাসের উপর বসিয়ে দিল।

'তাই তো,' বলল চিন্তিত কণ্ঠে।

নীচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর।

'এক কাজ করি বরং। চাচা-চাচী না ফেরা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করি। এলেই সাবধান করে দেব।'

বুদ্ধিটা খুব একটা পছন্দ হলো না আমার। কিন্তু কী আর করা, মেনে না নিয়ে উপায় নেই।

'আচ্ছা, কিশোর, জিনিসটা আসলে কী?' শুধাল মুসা। 'সাপ নাকি?'

উপলব্ধি করলাম, মুসা আসলে কথা বলে সময় কাটাতে চাইছে। ঠাণ্ডার কথা ভুলে থাকার জন্য বুদ্ধিটা ভালই। জেঁকে ঠাণ্ডা পড়েছে। জমে যাওয়ার জোগাড়। কুয়াশার মত পাতলা বৃষ্টি পড়ে চলেছে অবিরাম। চুল লেপ্টে যাচ্ছে

খুলির সঙ্গে, আর টি-শার্ট পিঠে।

মাথা দোলাল কিশোর। হাতের পিঠ দিয়ে চুল সরাল চোখের উপর থেকে।

'এখানে অত বড় সাপ আসবে কোত্থেকে?'

বাড়িটার দিকে চেয়ে রইলাম। গুঞ্জনধ্বনিটা কানে আসছে এখনও। বরঞ্চ জোরাল হয়েছে আরও।

'আচ্ছা, কিশোর,' বলল মুসা, 'এটা কোন ধরনের মিউট্যান্ট ইলেকট্রিক ঈল নয় তো?'

'যেটা পাওয়ার লাইনে ভর করে ঘুরে বেড়ায়?' যোগ করলাম আমি।

শ্রাগ করে হাঁটু জড়িয়ে ধরল বব। জবাবটা ও-ই দিল।

'হতেও পারে। ইঁদুর আর কাঠবেড়ালীরা ঘুরে বেড়াতে পারলে ওটা পারবে না কেন?'

'তাই বলে বাণ মাছ?' মাথা নেড়ে বলল কিশোর। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি।

বব দু'হাত ঘষছে। শরীর গরম করতে চাইছে বলে মনে হলো।

'তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা ঝাঁকাল ও। তারপর আমার দিকে তাকাল।

'অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছে আমার।'

'কেমন?'

'বাজে অনুভূতি!'

'বলো না শুনি,' বলল মুসা।

'ধরো, পায়ের পাতায় ভর করে বসে আছ। যেই উঠে দাঁড়ালে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে অবশ হয়ে গেল। অনেকটা সে রকম। তারচেয়েও খারাপ। অনেকই খারাপ।'

ববের হাত দুটোর দিকে চোখ রাখলাম। যে কথাটা এতক্ষণ ধরে ভাবছি অথচ মুখে আনছি না সেটা এবার হঠাৎ করেই জরুরী হয়ে পড়ল।

'কিশোর?'

'কী?'

সরাসরি ওর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করলাম।

'কিশোর, ওটাকে খসাতে হবে। মুক্তি পেতে হবে ওটার কাছ থেকে।'

কিশোর চিমটি কাটল নীচের ঠোঁটে। চিন্তামগ্ন।

বব চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

'বাঁটকুর হিরো সাজার শখ হয়েছে দেখছি!'

বাড়িটার দিকে চকিতে এক পলক চেয়ে ববের উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করলাম।

'ওটা কিন্তু আমাদের পিছু তাড়া করবে।'

জড়সড় হয়ে বসে ভ্রূ নাচাল ও।

'কী করে বুঝলে?'

'আমার মন বলছে।'

মুসা বাড়িটার দিকে ভীতচকিত চাউনি বুলাল।

'খাইছে!'

ওটা কোথায় আছে জানাটা বড় প্রয়োজন। আকারে কতখানি বড় হয়ে উঠেছে সেটাও জানা দরকার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয় দুটো।

কিশোরের দিকে ঘুরে চাইলাম। আইডিয়াটা কাজে খাটাতে হলে ওদেরকে বোঝাতে হবে। ওদের সাহায্যও পেতে হবে আমাকে।

'আমি যে সায়েন্স প্রজেক্টটা নিয়ে কাজ করছিলাম সেটা কারেন্টে চলে,' বললাম।

ব্যঙ্গ ঝরল ববের কণ্ঠে।

'কীসের মধ্যে কী, পান্তা ভাতে ঘি!'

'তুমি চুপ করে শুনবে কথাটা! ইলেকট্রিসিটি তোমার মাংসপেশীকে লাফাতে সাহায্য করে, বোকা। ইলেকট্রিসিটির কল্যাণেই তোমার মগজ কথা বলে শরীরের সঙ্গে। সেজন্যেই ওটা তোমাকে পেঁচিয়ে ধরার পর তোমার হাত দুটো অবশ হয়ে গিয়েছিল।'

ঢোক গিলল বব। আমার কথার গুরুত্বটা বুঝতে পারছে।

চোখের কোণ দিয়ে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে মুসা।

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ...'

'ওটা বিদ্যুৎ খায়। এমনকী আমাদের শরীরে যে ধরনের বিদ্যুৎ বইছে সেটাও। এখনই বাড়ির ভিতরে খাওয়ার মত আর কিছু পাবে না, সোজা চলে আসবে আমাদের খোঁজে। প্রাণটা স্রেফ শুষে বের করে নেবে শরীর থেকে।'

'রবিন ঠিক বলেছে,' সায় দিল কিশোর।

মুখের চেহারা পাল্টে গেল ববের। মুখ চুন।

'তা হলে কী হবে?'

পাঁচ

'এটা নিছক পাগলামি!' বলে উঠল বব।

স্কুল বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছি আমরা। চারদিক নিথর। জন-মানুষ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

আমার প্ল্যানটা কাজে দেবে বিশ্বাস করতে পারেনি বব।

কিন্তু আমি জানি এতে কাজ হতেই হবে।

এটাই আমাদের সামনে এখন একমাত্র পথ।

'তোমার হাতের কী অবস্থা?' জবাব চাইলাম ববের কাছে।

আমাকে লুকিয়ে জিন্সের পিছনে হাত ঘষেছে কয়েকবার। ব্যাপারটা লক্ষ করেছি, তবে ভান করেছি কিছুই দেখিনি।

কালশিটে উঠে এসেছে হাত থেকে। নীচের চামড়া কাঁচা আর গোলাপী রং ধরেছে।

বব ওর ডান হাতটা তুলে ধীরে ধীরে মুঠো পাকাল।

'যথেষ্ট ভাল।'

মাথা ঝাঁকালাম। ওকে প্রয়োজন হতে পারে আমার।

'বেশ, এসো।'

ওদেরকে পিছনে নিয়ে হলঘর ধরে এগিয়ে চলেছি। সারিবদ্ধ ক্লাসরুমগুলোর পাশ দিয়ে। আমরা আগেও এসেছি এখানে। ফলে, চিনতে কষ্ট হচ্ছে না।

স্কুলটা নতুন। সবটাই মাটির নীচে। বিল্ডিংগুলোর মাঝখানে যে হলগুলো রয়েছে সেগুলো বাইরে।

এ শহরে আর যাই হোক জায়গার কোন অভাব নেই।

যে ঘরটিতে সায়েন্স প্রজেক্টগুলো রাখা আছে সোজা সেখানে চলে এলাম।

'এটাই,' বলে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে, দরজার গায়ের ছোট্ট ফোকরটায় চোখ রাখলাম। সব কটা প্রজেক্ট সাজিয়ে রাখা দেখতে পেলাম।

কিশোর চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। খুলতে চেষ্টা করল দরজাটা। এবার এক পাশ ধরে হাঁটতে শুরু করল। দেয়ালের উপরদিকের জানালাগুলো নিরীখ করছে। মুসাকে বলল ওকে উঁচু করতে।

দু'হাত জুড়ে কিশোরকে দাঁড়াতে দিল মুসা, তারপর শূন্যে তুলে ধরল।

'শক্ত করে ধরে থাকো!' জানালা থেকে ঝুলছে কিশোর।

দাঁতে দাঁত পিষে সহ্য করছে মুসা। ও বলেই পারছে। আমাদের কারও সাধ্য হত না।

শব্দ পেলাম কী যেন করছে গোয়েন্দাপ্রধান। একটু পরে ওকে আর দেখা গেল না। জানালাটা গলে কষ্টেসৃষ্টে ভিতরে সেঁধিয়ে পড়েছে ও।

মিনিট দুয়েক পরে হাট হয়ে খুলে গেল ক্লাসরুমের দরজা।

'মনে হচ্ছে অ্যালার্ম বাজিয়ে দিয়েছি,' বলল কিশোর। 'অসুবিধে নেই। শুনছে কে?'

কামরাটায় একবার নজর বুললাম। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া কেমন অদ্ভুত লাগছে যেন।

'যতগুলো সম্ভব লাইট জ্বেলে দাও। ওটা রাস্তা চিনে চলে আসুক এখানে।' বললাম।

'সত্যি আসবে তো?' মুসা অনিশ্চিত গলায় জানতে চাইল।

সায়েন্স প্রজেক্টগুলোর কাছে হেঁটে এলাম। তুলে নিলাম যে কটা ব্যাটারি পেলাম।

'শিয়োর হওয়ার একটাই উপায়। চাচার বাসা থেকে এখানে আসার রাস্তায় এগুলো ছড়িয়ে দিতে হবে।'

'কাজ হবে?' ববের প্রশ্ন।

'তুমি বুঝি হাত-পা গুটিয়ে ওটার অপেক্ষায় বসে থাকতে চাও?' পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

চোখ নামিয়ে নিল ও।

কিশোর আর মুসা ব্যাটারিগুলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। বব আহত, ওকে আর কষ্ট করতে দিল না।

এদিকে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়লাম বাকি কাজ নিয়ে।

ক'মিনিট পরে দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এল কিশোর আর মুসা। হাঁপাচ্ছে।

'আসছে!'

দৌড়ে চলে গেলাম দরজার কাছে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে এখন। তেরছা হয়ে নেমে আসছে আকাশ ফুঁড়ে।

বাতাসের ঝাপ্টায় দুলছে বিদ্যুতের তার। বিচিত্র সেই কড়-কড়, ভন-ভন শব্দটা শুনতে পাচ্ছি।

কালো পিশাচ আসছে!

'এটা কীভাবে কাজ করবে, রবিন?' ববের জিজ্ঞাসা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে গেলাম মেশিনটার কাছে। 'এর নাম টেসলা কয়েল।'

'তার মানে?'

'টেসলা কয়েল টেসলার আবিষ্কার। স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় এটায়। প্রচুর পরিমাণে।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল মুসার।

'তবে তো মহা বিপদ!'

টোকা দিতেই চালু হয়ে গেল যন্ত্রটা। নীলচে বিদ্যুৎ শিখা মাথা তুলল। দণ্ডগুলোর শেষ প্রান্তে যে অনেকগুলো বল রয়েছে তাদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ল। এবার ববের দিকে ফিরে চাইলাম।

'বাসায় ওটা ফুলে মোটা হচ্ছিল খেয়াল করেছ নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, তাতে কী?'

কিশোর এবার যোগ দিল আলোচনায়।

'বেশি খেলে কী হবে বুঝতে পারছ না?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে হেসে ফেলল বব।

'পারছি। বেলুনে অতিরিক্ত বাতাস ভরলে যা হয় আরকি।'

আবারও ভ্রূ কুঁচকাল মুসা।

'কিন্তু ধরো যদি কাজ না হয়?'

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার। দরজার কাছে ফিরে গেলাম।

কাজ হতেই হবে। নইলে ভয়ানক মোটা, ক্ষুধার্ত এক পিশাচের পাল্লায় পড়ে যাব আমরা। তারপর কী হবে জানি না।

দরজা দিয়ে চাইতেই চমকে উঠলাম। বিদ্যুতের তারগুলো দোল

খাচ্ছে, কিন্তু একটা তারকে বাকিগুলোর চাইতে অনেক বেশি মোটা দেখাচ্ছে।

'কিশোর, মুসা, বব!'

এক দৌড়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। আমাদের চোখের সামনে ঘটে গেল আরেক অদ্ভুত ঘটনা। মোটা তারটা লম্বা হতে শুরু করল ক্রমেই। লম্বা আর সরু।

আমার গা ঘেঁষে এল বব।

'এখন বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা অত লম্বা হয়েছিল কীভাবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

স্ট্যাটিক জেনারেটরের কাছে ফিরে এলাম আমি।

ওরা অনুসরণ করল আমাকে।

'ওটা যদি সবার আগে স্কুলের পাওয়ার সাপ্লাই গ্রাস করে?' বব ভয়ার্ত কণ্ঠে জানতে চাইল।

ওর দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম। দ্রুত খেলে যাচ্ছে মগজ। ও ঠিকই বলেছে।

'আমরা ব্যাকাপ জেনারেটরটা ব্যবহার করতে পারি। ওটা এখুনি চালু করতে হবে। জলদি এসো!'

ক্লাসরুম থেকে তীরের মত ছুটে বেরিয়ে এলাম। স্কুলের পিছনে শ্যাকটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এ স্কুলের কয়েকটা ছেলে জিনিসটা আমাকে দেখিয়েছিল। বলেছিল, শীতকালে ভারী তুষার জমে গেলে যাতে ব্যবহার করা যায় সেজন্য এটা রাখা হয়েছে।

শ্যাকটা বন্ধ।

অসহায়ের মত ববের দিকে চাইলাম। ও এ স্কুলের ছাত্র। হঠাৎই দৌড়ে চলে গেল ও। একটু পরে ফিরে এল হাতে একটা কুঠার নিয়ে।

'কোথায়...?'

'ফায়ার কেস,' ত্বরিত জবাব দিল।

মাথা ঝাঁকিয়ে পিছে সরে এলাম। মুসা ববের কাছ থেকে কুঠারটা নিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করল দরজায়। এক আঘাতেই কাঠসহ খসে পড়ে গেল তালা। লাথি মেরে দরজা খুলে দিল ও।

এগিয়ে এল কিশোর।

'আমি জেনারেটর দেখছি। তুমি ওদিকে যাও,' জরুরী কণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

ঘুরে দাঁড়ালাম। ক্লাসরুমের দরজার কাছে এসে ভিতরে চোখ রাখলাম। স্কুলবিল্ডিঙের বাতিগুলো কেঁপে-কেঁপে উঠে নিভে যাচ্ছে।

'জলদি করো, কিশোর! বিদ্যুৎ দরকার আমাদের।'

'এই তো হয়ে এল।'

বুদ্ধিটা কাজে দেবে বলে মনে হচ্ছে না। জেনারেটরটা চালু করা গেল না এখনও।

কালো পিশাচকে ক্লাসরুমে ঢুকাতে হবে। এবং এখুনি।

মাথা নুইয়ে, ছুটে বেরিয়ে এলাম বৃষ্টি উপেক্ষা করে।

বন্ধুরা পিছন থেকে নাম ধরে ডাকছে, কান দিলাম না।

'মেশিনটা চালু করো!' চেঁচালাম। দৌড়ের গতি বাড়িয়ে দিলাম।

পিশাচটাকে মেইন পাওয়ার লাইন থেকে কৌশলে সরিয়ে এনে, ঢুকিয়ে দিতে হবে ক্লাসরুমে। এখুনি। টেসলা কয়েল যতক্ষণ হাই-ভোল্টেজ স্ট্যাটিক ওগরাবে, তার মধ্যেই সারতে হবে কাজটা।

স্কুলবিল্ডিঙের কোনা ঘুরে বেরিয়ে এসে, থেমে পড়লাম।

কালো পিশাচ ঝুলছে পাওয়ার লাইন থেকে। স্কুলের পাওয়ার বক্সে সেঁটে রয়েছে ওটার মুখ গহ্বর।

'অ্যাই!' চিৎকার করে উঠলাম। কানে শোনে কিনা জানি না, কিন্তু কোথায় পাওয়ার রয়েছে ঠিকই টের পায়।

কিশোরদের ফেলে যাওয়া একটা ব্যাটারি চোখে পড়ল। ওটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম। তারপর চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে, দৌড় লাগালাম পিশাচটাকে লক্ষ্য করে।

ঝট করে মুখ ফিরাল ওটা। ছিটকে পড়ল ফুলকি। বেশি কাছে এসে পড়েছি আমি। ঘুরে দৌড় দিতে চাইলাম। ছোবল হেনে, আমার ঠিক পিছনে মাটিতে আছড়ে পড়ল ওটা। দৌড়ের গতি বাড়ালাম, কিন্তু চলে যেতে পারলাম না নাগালের বাইরে।

ক্লাসরুমের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি। 'অ্যাই!' হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। আশপাশে চেয়ে ব্যাটারি খুঁজে পেলাম না। কাজেই দু'পা এগিয়ে যেতে হলো ওটার দিকে।

পরমুহূর্তে, টাল খেয়ে ক্লাসরুমে ঢুকে পড়লাম পিছু হটে। এঁকেবেঁকে,
সর্পিল গতিতে তেড়ে এল পিশাচটা। গুঞ্জনধ্বনি জোরাল হয়ে কানে বাজল।
টেসলা কয়েলের পিছনে দৌড়ে গিয়ে আড়াল নিলাম। থেমে দাঁড়াল পিশাচটা।
মাথা-লেজ, দু'দিকই পাক খাচ্ছে।
টেসলা কয়েলটা পরখ করলাম। থেমে গেছে!
হামলে পড়লাম অন-অফ সুইচটার উপর। বৃথা। কোথাও কোন তার-টার
আলগা হয়ে গেল নাকি? ঝাঁকুনিতেও কাজ হলো না। ওদিকে, শরীর মুচড়ে
মুখ হাঁ করে আমার দিকে তেড়ে আসছে মৃত্যুদূত!
'জলদি চালু হ!' আওড়ালাম নিচু স্বরে। কাঁপা হাতে কয়েলের আলগা
তার টানলাম, নাড়া দিলাম।
সপাং করে পিছিয়ে গিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো
পিশাচ। ওদিকে একই সঙ্গে স্থির বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল টেসলা কয়েলে।
নীলচে স্ফুলিঙ্গের ঝলকানি দেখে পিশাচটা পেঁচিয়ে ধরল ওটাকে। কয়েলে
চুম্বকের মত লেগে গেল কিলবিলে, কুৎসিত মুখটা। পিছিয়ে গিয়ে দেয়ালে পিঠ
দিয়ে বসে পড়লাম। বিস্ফারিত চোখে ঘটনাটা দেখছি।
কিশোরের গলা কানে এল এ সময়।
'রবিন, এই নাও, আমার হাতটা ধরো!'
মুখ তুলে চাইলাম। দেখি কিশোর যে জানালাটা খুলেছিল, ঝুলছে সেটা
থেকে। তারটার উদ্দেশে চকিত চাউনি বুলালাম। বাস্কেটবলের আকৃতি
পেয়েছে এখন ওটা। এবং ক্রমশ ফুলছে। কুচকুচে কালো দেহ থেকে আগুনের
ফুলকি ছিটকে বেরোচ্ছে। দোরগোড়ার ঠিক কাছেই কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে
রয়েছে ওটা।
টলমল পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিশোরের উদ্দেশে দৌড় দিলাম। জানালার
নীচে একটা ডেস্ক টেনে এনে উঠে দাঁড়ালাম ওটার উপরে। একবার মাত্র
পিছু ফিরে চাইলাম। তখনও টেসলা শুষে খাচ্ছে পিশাচটা। অতিরিক্ত
পানি ভরা কোমের মত দেখাচ্ছে। ফুলে উঠছে প্রতি মুহূর্তে-বিপজ্জনক
ভঙ্গিতে।
ঘুরে দাঁড়িয়ে আঁকড়ে ধরলাম কিশোরের হাত।
প্রথমটায় মনে হচ্ছিল ধরে থাকতে পারব না। কেননা, আঙুল পিছলে
যাচ্ছিল। আমার লাথি খেয়ে উল্টে গেল ডেস্কটা। কিশোর আর মুসা দু'জনে

দু'হাত ধরে টেনে তুলল আমাকে।
কালবিলম্ব না করে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম চারজনে স্কুল ছেড়ে। ভেজা
পেভমেন্টে জড়াজড়ি করে পড়ে গেলাম। মুহূর্ত পরে বিকট শব্দে কেঁপে উঠল
দালানটা। জানালা উড়ে গেল। কাঁচ ভেঙে গেল চুরমার হয়ে।
পচা দুর্গন্ধ 'ভক' করে নাকে এসে ধাক্কা দিল। উঠে দাঁড়ালাম টলমল
পায়ে।
সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।
'এখানে আর না,' তাড়া দিল কিশোর। 'শিগ্গির বাসায় চলো।'
জ্র কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে রইল বব।
'বাবা-মা ফিরলে কী বলব?'
শ্রাগ করলাম।
'তুমিই বলো।'
'ওরা বিশ্বাস করবে না। আমি নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে
পারছি না, ওরা বিশ্বাস করবে কেন?'
নাক কুঁচকালাম আমি। কল্পনায় দেখার চেষ্টা করলাম, চাচা-চাচীকে
ইলেকট্রিক ঈল আর প্রকাণ্ড বড় সাপের কথা খুলে বলছি। পাওয়ার লাইনে
বাস করে ভয়ানক কিছু একটা, বিদ্যুৎ খেয়ে সেটা মোটা হয়, ছোবল হানে-এ
সব। একটা চিন্তা এ সময় ঘাই দিল মগজে। কালো পিশাচ কি একটাই ছিল,
নাকি আরও আছে?
পাওয়ার লাইনের দিকে মুখ তুলে তাকালাম।
'কিশোর?'
আমাকে এক পলক দেখে নিয়ে পাওয়ার লাইনে দৃষ্টি রাখল
গোয়েন্দাপ্রধান।
'কিচ্ছু ভেবো না, রবিন। আবার যদি কোনটা উৎপাত করে সেটাকেও
আমরা কায়দা করে ফেলব। কী বলো?' অভয় দিয়ে বলল।
মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানালাম।
'চাচা-চাচী যতটুকু বিশ্বাস করবেন,' বলল মুসা। 'ঠিক ততটুকুই বলব
আমরা। তার বেশি নয়। বলব যে, পাওয়ার লাইনে কী যেন সমস্যা দেখা
দিয়েছিল।'
বুদ্ধিটা সবারই মনে ধরল।

'ঠিক বলেছ,' খুশি প্রকাশ পেল ববের কণ্ঠে।

'কিন্তু আসল ঘটনাটা কী, কিশোর?' প্রশ্ন করলাম।

'মনে হয়,' নীচের ঠোঁটে চিমটি কেটে বলল গোয়েন্দাপ্রধান। 'ভিনগ্রহের কারবার। ওদের হয়তো বিদ্যুৎ দরকার ছিল, তাই এসে হামলা করেছে পৃথিবীতে।'

হেঁটে চলেছি, আমার দিকে চোখের কোণে একবার চাইল বব। তারপর এক হাতে হঠাৎই জড়িয়ে ধরল কাঁধ। গতি ধীর করে আনল, আমার যাতে ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে কষ্ট না হয়।

আমাদের দু'ভাইকে জড়াজড়ি করে হাঁটতে দেখে, পরস্পর চোখাচোখি হলো কিশোর আর মুসার। দু'জনেরই হাসি কান ছুঁয়েছে।

***

ammsumon@yahoo.com
http://www.murchona.com©

Sumon

A lonely man in the crowded planet